শিমুল ফুলের ছায়া

নৃপেন্দ্র সান্যাল

আনন্দধারা প্রকাশন

অজস্র গল্প না। লিখেও নৃপেন্দ্র সান্যাল ছোট গল্পকার হিসেবে একটি পরিচিত নাম। এই গ্রন্থে সংকলিত তাঁর গল্পগুলি দেশ ও চতুরঙ্গে প্রকাশিত হয়ে যত্নবান পাঠকমহল আলোড়িত করেছিল। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিকতা-অতিক্রান্ত গভীর বাস্তব তাঁর গল্পগুলির উপজীব্য। আপাতলোভনতার ক্লিন্ন অন্তরাল উন্মোচন তাঁর লক্ষ্য হলেও গল্পগুলি অন্য এক শুভ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ।

প্রকাশক

উৎসর্গ

শ্রীমতী উরস্থুলা গ্রিদাৎসি-কে

তৃতীয় পুরুষ

সবে তখন ঘণ্টা বাজল দুটোর। এরই মধ্যে সুমিত্রার ঘরের মত আর আর ঘরে সাবান, পাউডার এবং এসেন্সের গন্ধ। সাজ সুরু এখন থেকেই। একটু পর, চারটের কোল ছুঁয়ে যখন ঘড়ির কাঁটা, তখন থেকেই সুরু হবে লোক যাতায়াত। একটু আগেই সুমিত্রা সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে এসেছে। এখন বসল ছোট হাত আয়না সামনে নিয়ে। স্নো মাখল। তার ওপর পাউডার। ঘেমে যাওয়া মুখে মধ্যে মধ্যে বুঝি সাটিনের পাফটা লেপ্টে যায়। কখনো কখনো মৃদু হাতে বুলিয়ে নেওয়া সত্বেও। প্রায় সাদা হয়ে আসা মুখের ওপর কাজলে টানল ভুরু। চোখের কোনে সুর্মা। ফাঁপানো শাম্পু দেওয়া চুলের খোঁপায় রূপোর কটকি বুটিদার কাঁটা। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুমিত্রা কয়েকবার দেখল তার মুখ।

আয়না সামনে থেকে সরিয়ে এনে এবার দেখল বুক। বুঝি দেহের অন্য প্রান্তও। কখনো পাশ থেকে, কখনো বা সামনে আয়না রেখে, সাদা ব্রেসিয়ারের চাপে বুকের এক পাশটা কেমন উদ্ধত যেন। তার ওপর গায় নীল ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজ। গায়ের সঙ্গে বুঝি লেপ্টে গেছে, এই মুহূর্তে সুমিত্রার দিকে তাকালে মনে হবে তার শরীরের বঙ্কিম রেখাগুলো অনাবশ্যক রকমের স্পষ্ট। রঙীন সিল্কের সাড়ি আল্গা করে কোমরের ওপর পর্যন্ত পাড় তুলে দেওয়া। কাঁধের ওপর কাপড়ের আঁচল থাকতে চায় না আর।

টেবিলঘড়িতে চারটের তখনও দেরি। লাল ষ্ট্র্যাপের চটি পায়ে সুমিত্রা বার কয় ঘরময় পায়চারি করল। একবার এসে দাঁড়াল জানলার কাছে। বাইরে ছোট একটা মাধবীলতার চারা। দু' একটা ফুল। একটা কালো পোকা তখন একটি ফুলের ওপর বসে।

অন্য দেয়ালে বড় আয়নায় মুখ ঘোরাতেই সুমিত্রা আবার নিজেকে দেখল। হঠাৎ তার মনে হল, অনেকদিন আগে দেখা তাদের সামনের বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে তার তফাৎ কতটুকু? কিন্তু তখন তার অন্যকিছু মনে হয়েছিল। মনে মনে কি এক কুৎসিৎ মন্তব্য করেছিল। সবটা মনে হতেই কুঁকড়ে যায় সুমিত্রা। সেই মেয়েটি হয়ত ঠিক তারই মত কাউকে প্রতীক্ষা করছিল। আজকে সন্ধ্যায় সুমিত্রা যেমনটি করছে।

এখানে আসার পর প্রথমটা সুমিত্রার মানিয়ে নিতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। বাড়ির অনেকেই বলেছিল, জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর। গেট পার হলেই দু' পাশে সাজানো কাঁটা ঝোপের সারি। মাঝে মাঝে অল্প উঁচু গাছে ছোট ছোট সাদা ঝুমকো ফুল। কি যেন নাম। খানিক কথা থামিয়ে নামটা মনে আনার চেষ্টা করেছিল তাদেরই কেউ, যারা তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। একই কথার শেষটুকু তখন অন্য আর একজন ধরে নেয়। বলে, আর মাধবীলতা? সন্ধ্যে হলেই ফুরফুর করে গন্ধে!

ছিল, এর সব কিছুই ছিল এখানে, তবু সুমিত্রার ভাল লাগেনি। বুঝি যা শুনেছে, তার চেয়েও আরো কিছু বেশী ছিল। তবু না, তবুও না। তবু সুমিত্রা মানিয়ে নিতে পারেনি খুব তাড়াতাড়ি এখানকার আবহাওয়া। আশে পাশের লোকজন।

তবু তখন এরই মধ্যে এক আধজনকে ভাল লেগেছিল। যেমন বীনাদি। এখানকার অন্য একটি মেয়ে। এই যক্ষা হাসপাতালের নার্স।

এখানে এসেই প্রথম তার বীনাদির সঙ্গে আলাপ। বীনাদিই তখন তার কাছে এসে বলেছিলেন, কপালের দু'একটা আল্গা চুল পাট করে দিতে দিতে, 'সব ছেড়ে এসে মন খারাপ লাগছে?'

কথার জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লাগল দেখে। শরীরটা কেমন সবল। গায়ের রঙ কালো। মুখ হাত

নেড়ে কথা বলার সময় তাকে মেয়ে বলেই মনে হয় না ! শক্ত সবল পুরুষ মানুষ যেন একজন। তবু ভাল লেগেছিল। অত রুক্ষ চেহারার মধ্যেও বীনাদির কথাগুলো খুব মিষ্টি।

কথার কোনো উত্তর না পেয়ে বীনাদি নিজের কথার শেষটা পূরণ করলেন।

'আমরা তো আছি। ভয় কি তোমার। দেখো, আস্তে আস্তে সব কেমন ভাল লাগবে।'

সেদিন আর কোনো কথা হয়নি। ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে বীনাদি বেড়িয়ে গেলেন। সামনের রাস্তার বাঁকে একসময় তাঁর শরীরটা মিলিয়ে যায়। বীনাদি বোধহয় ততক্ষণ তার ঘরের দিকে। অথবা আর কারো খোঁজে। তেমন করে কথা বলা আর হলনা। কিন্তু সুমিত্রা কয়েকদিনের মধেই বীনাদির খুব ঘনিষ্ঠ, যেন তার পরম আত্মীয় হয়ে গেল।

ঘড়ির কাঁটা দেখতে আবার ঘরের ভেতর এল সুমিত্রা। বুক চাপা বাসের মত ছোট ঘর। দু'টি বিছানা। একটি তখনও খালি। বেডের পাশে একটি করে লকার। অন্যপাশে খালি দু'টি চেয়ার। খাটের নীচে এনামেলের বড় গামলা। আর মুখ আটকানো কৌটোর মত কি যেন একটা !

বাইরে তখনও রোদ স্পষ্ট। অনেকটা এলানো। চৌকাঠ থেকে সরে বিছানার ওপর এসে বসল সুমিত্রা।

খাটের ওপর বসে এবার তার মনে হয়, বীনাদি ছাড়াও আর একজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে এখানে। সে বিনয়। সুমিত্রা তার কিছুই জানেনা। জলে মুছে যাওয়া ছবির মত আবছা অস্পষ্ট মনে হয় তার।

সেই এক সকালের কথা :

কিছু আগেই বীনাদি ঘরে চলে গেছেন। কিন্তু সে তখনও দাঁড়িয়ে। বড় শিরিষ গাছটার নীচে। চন্দ্রমল্লিকার বেড ঘিরে

বাঁশের বেড়া ধরে। এদিক আর সেদিক একবার তাকাল। দেখল তার মত তখন আর কেউ নেই বাইরে। কেউ নেই তার মত অমন করে দাঁড়িয়ে। দু'একজন যাও ছিল, তারাও একটু একটু করে এগিয়ে গেছে লম্বা দিঘীর পথ ধরে। নির্দিষ্ট 'ওয়াক' তাদের শেষ হয়ে গেছে। সুমিত্রা হয়ত তখন কিছু ভাবছিল না। কিন্তু তবু তার চমক লেগেছিল কথা শুনে।

'আচ্ছা, মাধবী নামে একটি মেয়ে এসেছে এখানে। নতুন। সে কোন ব্লকে জানেন? অথবা কার কাছে গেলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে? এখন তো কোনো বাড়ীতেই ঢোকা যাবেনা।'

সুমিত্রা একবার তাকাল বিনয়ের দিকে। তারপর মাটি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা।

'এটা কি আমার জানার কথা।'

নিজের গলার আওয়াজ নিজের কাছেই যেন কেমন রুক্ষ শোনালো। তার গলার স্বর এতদিনে যে এতটা রুক্ষ হয়ে গেছে, তা যেন সেদিনই সে প্রথম বুঝতে পারে, তবু সে একটুও অবাক হয়নি।

বিনয়ও লজ্জা কম পায়নি। মাথা নীচু করে যেদিক থেকে সে এসেছিল, সেদিকেই চলে গেল।

বিনয় চলে যাওয়ার পর সুমিত্রার মনে হয়েছিল এরপর যদি বিনয়ের সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়, ক্ষমা চেয়ে সে শাস্তি নেবে। আর তার এই ইচ্ছা পুরণও হয়েছিল। তার পরেরদিন বিনয়ের সঙ্গে তার আবার দেখা হল। ক্ষমাও প্রার্থনা করেছিল সে। কিন্তু তা ওইখানে, ওই অতটুকুতে থেমে থাকেনি। এখন বিনয় সুমিত্রার অনেক বিকেলের সঙ্গী।

তবু কোথায় যেন মাঝে মাঝে ফিরে যায় সুমিত্রা।

বিনয়ের এই সঙ্গ, তার সান্নিধ্য তাকে আগের জীবনের কথা থেকে সরিয়ে আনতে পারেনা। সুমিত্রার মনে হয় অরুণের কথা।

অরুণ এখন বিয়ে করেছে। কিন্তু অরুণ বিয়ে করল কেন? এমন একটা প্রশ্নর ভারী আমেজ অনেকক্ষণ ধরে তাকে বিষণ্ন করে রাখে। যদিও সে জানে, এখান থেকে মুক্ত হয়ে গেলেও কেউ তাকে বিয়ে করবে না! তবু নেশায় ঝিমিয়ে পড়ার মত তার ভাল লাগে ভাবতে, অরুণ না বিয়ে করে কেন কাটিয়ে দিলনা তার সমস্ত জীবন। এমন তো অনেকেই করে! কিন্তু সব দিন এমন কথাগুলো তাকে আলতো ছুঁয়ে যায় না। এক এক সময় অনেক কথা ভীড় করে মনে। তখন বাইরের সঙ্গ-প্রতীক্ষা ছেড়ে সে ঘরে চলে আসে। কোনো কোনোদিন বীনাদি ঘরে থাকেন। তার কাছে অনেক কথা বলে যেন কথার তাড়া থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু তার কথার মানে থাকেনা অধিকাংশ সময়। তবু কিছু বলা চাই যেন। জোরে জোরে এক নিঃশ্বাসে অসংখ্য কথা বলে মন থেকে অন্য কথার উঁকি ঝুঁকি সরিয়ে দিতে। বীনাদি ভ্রু-সন্ধিতে কথাগুলো ধরতে চেষ্টা করেন। কিছু না পেরে অন্য কথায় নোঙ্গর ফেলেন। অথচ তিনিই বা কি বলবেন? সুমিত্রা তখন সেখানে নতুন।

'জান সুমিত্রা, সেদিন তুমি যে মেয়েটিকে দেখলে, সামনের বাড়ীতে, সে যখন এখানে প্রথম এল তখন তার কি কান্না! কারো কথা শুনবেনা। কারো কাছে কোনো কথাও বলবেনা। এমন কি আমার কাছেও না। আমরা গিয়ে কথা বলতে চাইলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন দেখ সে কেমন সহজ। সাজগোজ করে। হাসে। আর এখন তার অনেক বন্ধু।'

এ-ছাড়া আর কথা নেই। এই যক্ষা হাসপাতালের সকলের মুখে শুধু প্রতিবেশী রোগীর কথা, নয়ত রোগের। এর বাইরে কিছু আছে, একথা যেন এখানকার কারো মনে হয় না। সুমিত্রা এখন তাই বীনাদির কাছেও যায় না। ক্লান্ত বোধ করলে আস্তে বাইরে থেকে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

শুয়ে থাকতে থাকতে এক একদিন আকাশ অন্ধকারের ধুলো

ছড়ায়। সেই সব মুহূর্তে আরো বেশী করে তার অরুণের কথা মনে হয়।

তখন সবে অরুণের সঙ্গে তার কলেজে আলাপ হয়েছে। স্কুল ছেড়ে দুজনেই তখন কলেজের সীমানার মধ্যে। একদিন সকাল থেকে আকাশে মেঘ করেছে। অরুণ এক অবসরে বলল, 'আজ আর কলেজ নয়। চল অন্য কোথাও যাই।'

'কোথায়?'

দু'হাতে সামনে নেমে আসা চুল পেছনে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল অরুণ, 'তা, তো আমিও জানিনা। যে বাসে খুশী উঠব। আর যেখানে ইচ্ছে হবে নেমে পড়ব।'

সুমিত্রা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল।

দমদমের এক জনবিরল প্রান্তে এক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সারা দুপুর তারা কাটিয়ে দিয়েছিল। অরুণের কাছে কি যেন একটা কবিতার বই ছিল। একটানা অনেকগুলি কবিতা পড়ে যখন সে থামল, তখন অন্ধকার। আকাশের মেঘ অনেক সরে গেছে। সুমিত্রা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তুমি আমায় তারা চিনিয়ে দাও।'

অরুণের বুকে মাথা রেখে কথা শুনছিল সুমিত্রা। আকাশে তারার অবস্থান।

তারপর সে পরিচয় আরো তিন বছর ছিল।

কেমন যেন অস্পষ্ট ছায়ার মত কথাগুলো সুমিত্রার মনে এসে মিলিয়ে যায়। সমস্ত শরীর তার সে কথায় শিরশির করে ওঠে। মন থেকে মুছে ফেলতে চায় অরুণকে। কিন্তু পারে না। আর, আর বুঝি সরিয়ে দেবার উপায় নেই। প্রথম যেদিন সে অরুণকে ভেবেছিল, অরুণকে দাগ কাটতে দিয়েছিল তার মনে, তখন থেকেই তার মনে, তখন থেকেই তার মনের কোন গতি এই ভাবনাই ঠিক করে দিয়েছে।

তিন বছর ধরে সুমিত্রার সব কিছু গ্রহণ করে আর একজনকে বিয়ে করল অরুণ। না করে কি সে পারত না? প্রশ্নটা ক্রমেই সুমিত্রার মনে মিলিয়ে যায়। কারণ সেও তো অরুণের বিয়ের আগেই বিতোষকে গ্রহণ করেছিল।

হয়ত ভেবেছিল যে, আর রোগমুক্তির পরও সে অরুণের যোগ্য হয়ে উঠবে না।

যক্ষা সেরে গেলেও কি আর বিয়ে হয়? আর তার এমন অসুখ বলেই তো অরুণ তার সান্নিধ্য ছেড়ে গিয়েছিল।

একই কথার সূত্রে অন্য কথা তার মনে আসে। বিতোষের কথা।

তখন সুমিত্রা পুরীতে। অসুখের তখন তার প্রথম দিক। অনেকখানি সুস্থ হবার পর ডাক্তার বললেন চেঞ্জে পাঠাতে। সুমিত্রা চেঞ্জে এল, পুরীতে। অনেক কাল ঘরবন্দী থাকার পর ছাড়া পেল সে পুরীর সমুদ্রতীরে। সেই স্বচ্ছন্দ পরিসর আর সামুদ্রিক হাওয়ায় হঠাৎ সে এক আলাদা পৃথিবীর স্বাদ পেল যেন। নিজেই যেন আলাদা মানুষ হয়ে গেল। চোখে মুখে আর সেই পাণ্ডুর ছাপ নেই। চোখের নীচে কালি। সমুদ্রের কালো হাওয়া শরীরের রেখায় রেখায় সজীব দাগ টানল। এবার, এতদিন পর সুমিত্রা হাসল। ঠোঁটের ফাঁকে একটু নয়। পরিপূর্ণ বুকে অনেকটা উচ্ছল হাসি। আর, আর গানও করল একদিন। প্রায় একা, বালুর চরে বসে। খোকন একটু এগিয়ে গেছে ঝিনুক কুড়োতে। সেই অবকাশে গান করছিল সে।

হঠাৎ তার গান থামাতে হল। বলা যায় গান থেমে গেল তার। অনেকক্ষণ ধরে হয়ত গান করত সে। অথবা কতক্ষণ বলা যায় না। সামনে তখন দাঁড়িয়ে বিতোষ। সঙ্গে খোকন। সুমিত্রার মনে হল, সে যেন তাকে দেখেছে। কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ানোর এই ভঙ্গীটি যেন তার বিশেষ চেনা। মনের

পুরনো পর্দাগুলো সরিয়ে ঠিক যেন জেনে নিতে চায়, কোথায় সে দেখেছে তাকে। অরুণের ঝিমিয়ে পড়া স্মৃতির ওপর বিতোষ যেন নতুন একটি ফলক। এবার, এই এতক্ষনে মনে হয় সুমিত্রার অরুণও মধ্যে মধ্যে এমন করে দাঁড়াত।

কথা বলেছিল সেদিন বিতোষ প্রথম।

'গান শুনতে এলাম, গান যদি থামিয়ে দেন নিজেকে বড় অপরাধী মনে করব।'

বিতোষ থামল। সুমিত্রাও চুপ। এইটুকু মাত্র অবসর। এরই মধ্যে খোকন কথা বলল।

'জান দিদি, বিতোষদা আমাদেব পাশের বাড়ীতেই থাকেন। আমাকে রোজ অনেক গল্প বলেন। আর আমাদের মত উনিও কোলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন।' হঠাৎ যেন আবার তার কি মনে হল, একটু থেমে পেছনেব দিকে তাকাল।

'এই যা, ঝিনুক তো একটাও আনা হয়নি।' তাড়াতাড়ি খোকন পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেল। সুমিত্রা সব বোঝে। অরুণ তাদের বাড়ী এলে তার দাদা এমনি কবেই চলে যেতেন। সুমিত্রার মনে হয়, বয়সের তুলনায় খোকন বুঝি একটু বেশী বুদ্ধিমান।

আবো কিছু কাছে সরে এল বিতোষ।

'আপনার কথা আমি খোকনেব কাছে রোজ শুনি। কিন্তু আপনার মত যে আপনার গানও ভাল, একথা তো সে বলেনি। আলাপ করতে এসে আপনাব গানও একটু শোনা হয়ে গেল।'

ততক্ষণে সুমিত্রাও হাটুর আড় ভেঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকখানি রাত হয়েছে তখন। আর সামান্য একটু পর লোক প্রায় থাকবে না এখানে। কথায় কথায় তারা দু' জনেই এগিয়ে এল।

হাঁটা থামাল হঠাৎ বিতোষ।

'বাঃ, সম্পূর্ণ গানটা না শুনিয়েই চলে যেতে চান ?'

'আজ আর না। কাল, কাল নিশ্চয়ই গান শোনাব আপনাকে।' সুমিত্রা যেন তার কথায় সম্মতি চায়।

'কেমন ?'

অরুণ ছাড়া এমন করে কথা বলতে বুঝি বিতোষের কাছেই সে পারল। অরুণের চলে যাওয়ার পর সুমিত্রার কত কথাই জমা হয়ে আছে। অন্য কোন পুরুষকে সে তা' বলতে চেয়েছিল সে কথা। তার পর শুনল সেদিন বিতোষ।

কথামত গান শুনিয়েছিল সুমিত্রা পরের দিন। সেদিনও সমুদ্রের তীরে। বালির ওপরে বসে। পা ছড়িয়ে। তারপর সেই স্থান-পরিবর্ত্তন হল। বিতোষেব ঘরে।

সুমিত্রার জীবনে বিতোষ দ্বিতীয় পুরুষ !

কিন্তু তারপর ?

সুমিত্রার এক সন্ধ্যার কথা মনে হয়। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল সে। বই-রাখা টেবিলের কোনটায় মাথা দিয়ে বিতোব বসেছিল। ঘরের অন্য এক প্রান্ত থেকে একটি মোমবাতি এনে জ্বালতে গিয়েছিল সুমিত্রা। কিন্তু সে আর তা পারেনি। হাতদুটো মুঠোয় নিয়ে বিতোষ তাকে কাছে এনে বসালো। বলল।

'এমনভাবে আরো কতকাল আমরা থাকব। কবে তোমায় ছোঁয়ার অধিকার পাব ?'

একটু একটু বুঝি বিতোষের অনভিজ্ঞ গলা কেঁপেছিল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায়নি।

তার শক্ত মুঠোয় তখনও সুমিত্রার হাত। আস্তে আস্তে হাত মুক্ত করে নিয়ে বিতোষের চুলে বিলি দিতে দিতে সে বলেছিল :

'আমি তোমার এত কাছে। এই তোমার গায়ে আমার হাত। যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ, সেদিনই তো এ অধিকার তোমায় আমি দিয়েছি।'

তারপর কথা তার থামল। প্রতীক্ষায় পাথর যেন বিতোষ।

আরো কথা শোনার প্রতীক্ষায়। বড় ঘড়িটার শব্দ, টিক টিক। আর সব বুক চাপা, কেমন যেন স্তব্ধ। খানিকটা বাইরের বাতাসের মত তখন কথা বলেছিল সুমিত্রা, বুঝি পুরনো বাড়ীর গুমোট ঘরে হঠাৎ একফাঁকে আসা একটু বাতাস।

'আমার তো সব কথা তুমি জাননা।'

'কিছুই আর জানতে চাইনা আমি।'

'কিন্তু পুরীতে অনেকদিনের জন্য চেঞ্জে লোক আসে কেন, তাও কি তোমার জানা ?'

প্রথম বুঝি ধাঁধার মত, তারপর স্পষ্ট হয়েছিল কথাটার অর্থ বিতোষের কাছে।

'তবে শুনেছি'—

কিছুই আর লুকোয়নি সুমিত্রা। ভাঙা ভাঙা কথায় বলল :

'হাঁ, টি বি রোগীই আসে। আমারও ও অসুখ হয়েছিল। এখন যদিও একেবারেই সেরে গেছি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি লুকোতে চাইনা কিছুই।'

সব কথা তখনও তার শেষ হয়নি। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেল। সুমিত্রার হাতখানা সরিয়ে দিল বিতোষ। কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়াল, বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত্রাও চলে এসেছিল। পরের দিন জানতে পারল খোকনের কাছে, বিতোষ চলে গেছে পুরী থেকে।

সুমিত্রা এর কিছু বুঝি অনুমান করেছিল। তাই আর তেমন অবাক হয়নি। তবু অনুভব করল, গলাটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে। বিক্ষত ফুসফুসে বুঝি আর বাতাস যাচ্ছেনা। আবার তার কাশি বাড়ল। আবার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করল। তারপর এখানে, এই হাসপাতালে আসার আগের দিন পর্যন্ত সে বিছানা থেকে ওঠেনি।

সুমিত্রা এখন বেশ বোঝে, যে-ই তার অসুখের কথা শুনবে,

সে-ই দূরে সরে যাবে। যেমন গেছে অরুণ। যেমন গেছে বিতোষ। তাকে ছোঁবেনা পর্যন্ত কেউ। এমনকি অন্যত্রও যাদের যাতায়াত তারাও না। তাই বিনয়ের কাছে সুমিত্রা হাসপাতালের রোগী নয়। এখানকারই এক রোগীর ছোট বোন মাত্র। প্রত্যহ সে এখানে আসে দিদির খোঁজ খবর নিতে। আর যে কেউ আসেনা, আসতে চায় না। ভয়েই তারা কাঠ। তা ছাড়া সুমিত্রা এক কড়া কলেজের ছাত্রী। কলেজের বাসে তার যাতায়াত। আর এমন বাড়ীতে থাকে, যেখানে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা আলাপ করে শুনলে সকলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বিনয়ের হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথাও দেখা করার কথার উত্তরে বিনয়কে এই কথা বলার সময় এক ফাঁকে সুমিত্রার মনে উকি মেরেছিল, অরুণ কতবার তার বাড়ী গেছে। কত উপলক্ষে, কত জন্মদিনে।

বাইরে তখন ঘণ্টা বাজল চারটের। সব কথার ঢেউ সরিয়ে সুমিত্রা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। বাইরে যাবার পথে আরো একবার দেয়াল-আয়নায় নিজেকে দেখল। পাউডারের প্রলেপ দিল আর একবার। বুক থেকে শাড়ির বিস্তার সঙ্কুচিত করে পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিল। পেছনে ব্লাউজের রুইতনের ছক কাটা জানলায় তাব পিঠ দেখা যায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে পিঠে।

এবার এসে সে দাঁড়ালো রাধাচূড়ার বড় গাছটার নীচে। বড় রাস্তায় যাবার পথে যেটি পড়ে। একটু দূরে মেন্দী কাঁটার ছাঁটা বেড়া। দু' একটা নাম না জানা গাছ। তারই একটার বুক জড়িয়ে ধরেছে ঝুমকো লতা। আরো একটু দূরে কলা ফুলের ঝাড়। লাল, হলুদ রঙের ফুলে সবুজ পাতা প্রায় দেখা যায়না।

ওদিক থেকে ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল বিনয়। দূর থেকে হাসতে হাসতে কাছে এল। দু' চোখ রহস্যে তার ঘন।

'এত যে সাজ, কার জন্যে ?'

সুমিত্রা একটু হাসল। একবার নিজের দিকে তাকাল। তারপর বিনয়ের দিকে।

'সাজ করেছি লোক ভোলাতে। আর দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য। অনেকদিন আলাপ হল। এখন হয়ত পুরনো মনে হবে, তাই এমন সাজ।'

সত্যই তা সুমিত্রার মনের কথা।

পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে থাকল পোর্টুলিকার বেড। এতকাল যার পাশে দাঁড়িয়ে তারা গল্প করেছে। সদর রাস্তার পাশ কাটিয়ে এবার ঢুকলো সুপারি-সারি বাগানে। আর একটু সামনে পুকুর। হাওয়া ঝির ঝির। অন্ধকার নামানো তেঁতুল পাতার ঝাড়ে। সর্ সর্। চাপা শব্দ, হিম বুক। দীঘির জলে জলচরি ঢেউ।

তারা এসে বসল। দেবদারুর মাথায় ডুবন্ত সূর্যের আলো দানা বাঁধে। তার খানিক বুঝি তাদের চোখে মুখে। দু' আঙুলে একটা মরা ডালের বুক ভাঙতে ভাঙতে সুমিত্রা চারপাশে তাকায়।

একটু পরেই কেমন যেন স্তব্ধ সব। দূরে ডাক, ঝিঁ ঝিঁর। গুন গুন মশার। এবার নীচু গলায় কথা বলল কেউ, বুঝি দীঘির জলে নুড়ি পড়ল কয়েকটা।

ততক্ষণে অন্ধকার আরো ভারি। পাতা ঝোপ গাছের নীচে অন্ধকার আরো অনেক ঘন।

বিনয়ের হাত তুলে নিল সুমিত্রা নিজের হাতে। আস্তে, মন্থর কণ্ঠে প্রশ্ন ঃ

'ভয় করে না তোমার এখানে কারো পাশে এসে বসতে!'

'ভয়ের আবার কি আছে? তুমি তো আর রোগী নও। তা' ছাড়া রোগী হলেই বা কি? স্পুটাম নেগেটিভ হলে ছুঁলেও দোষ নেই।'

আস্তে আস্তে বিনয় ঘাড় কাত করল সুমিত্রার মাথার ওপর।
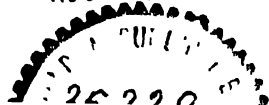
এরই মধ্যে কখন যেন ওরা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। বুকের কাপড় কাঁপে সুমিত্রার। হয়ত বাতাসে। কিম্বা বুকের শব্দে। গায়ে যেন তার কেমন জ্বালা। মুখটা যেন পুড়ে যায়।

ব্লাউজের দু' একটা বোতাম খুলে দিল সুমিত্রা। লাগুক, গায়ে তার একটু হাওয়া লাগুক। ভেতরে ভেতরে সে ঘেমে গেছে। সমস্ত শরীরে তার অসহ্য জ্বালা।

হাতের নীচে হাত রেখে এক হাতের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিনয় সুমিত্রার দেহটাকে আরো ছোট করে আনল। বিনয়ের দ্রুত নিঃশ্বাসে কি এক সুন্দর শিহর। সুমিত্রার কাঁধের কাপড় কাঁপে। বিনয়েব নিঃশ্বাসেব তাপ লাগল সুমিত্রার মুখে। তার গালে। বুঝি সেই সঙ্গে তার মুখটাও পুড়িয়ে দিল।

বিনয়ের হাতের আঙুল কাঁপছে থরোথর। কেমন যেন একটু বেশী উষ্ণ। বুঝি জ্বর উঠেছে। সুমিত্রার পেটের ওপর ঈষৎ খোলা অংশ ঈষৎ উত্তাপে ছ্যাঁৎ করে উঠল। বিনয়ের হাত লেগেছে সেখানে। তার শরীরের আঁচ। সুমিত্রার দু' একটা চুল উড়ে পড়ছে। গুছিয়ে দিতে দিতে, আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, আরো গভীর করে তার মুখ দেখার চেষ্টা করে বিনয়। কিন্তু অন্ধকারে কি মুখ দেখা যায়? মুখ সরিয়ে এনে অনুভব করা যায় মাত্র।

সুমিত্রার মুখের দিকে বিনয়েব মাথা নুয়ে এল।

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা। গলায় যেন কেমন খুস খুস অনুভূতি। কাপড়ের আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে যেন দৌড়ে পালাল সে সেখান থেকে। অন্ধকারে গাছের ছায়ায় তাকে যেন খুঁজে পাওয়া গেল না। পিছু তাড়া খাওয়া মানুষের মত সে তার ঘরে এসে পৌছায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে বীনাদি। সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সুমিত্রা। অমন করে দৌড়ে আসতে দেখে বললেন:

'সামনের বাড়ীতে গিয়েছিলে বুঝি স্পুটাম রিপোর্ট জানতে?

কিন্তু বল, তোমার কি লাভ হল জেনে, স্পুটাম তোমার পজিটিভ। এমন করলে অসুখ তোমার সারবে না সুমিত্রা।'

কিন্তু বীনাদি জানেন না, রিপোর্ট সে আগেই জেনেছে। তবু বীনাদির কোন কথা তাকে ছুঁয়ে গেল না। তার এ কথার কোন উত্তর দিলনা সুমিত্রা। এক আড়ষ্ট আবেগে বুক থেকে তার গলা পর্যন্ত চাপা।

হঠাৎ এবার সে ভেঙে পড়ল বীনাদির বুকে। তার স্বাস্থ্যঘন বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে সুমিত্রা বলল :

'তুমি আমায় চুমু খাও বীনাদি। এইখানে গালে, বুকে, আমার পিঠে। অনেক অনেকবার আমাকে চুমু খাও। আমাকে তুমি জড়িয়ে ধর।'

সুমিত্রার রুগ্ন দু' হাতে বীনাদির কোমর জড়ানো। তার মনে হয়, এক বিষহীন সাপ যেন তাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে।

সুমিত্রার হাত আল্গা করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল বীনাদি। সমস্ত ক্ষমতা যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। শূন্যে দৃষ্টি তুলে একবার সে বীনাদির দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে পাশ ফিরল।

ঘরে তখনও আলো। তার কিছুটা উপচে গিয়ে বাইরে পড়েছে। মাধবীলতার ঝাড়ে। সেই স্বল্প আলোতেও সুমিত্রা দেখল, কালো পোকাটা শুকিয়ে লাল হয়ে যাওয়া শীর্ণফুলের প্রায় সব পাঁপড়িই কেটে ফেলেছে।

টাইপরাইটার

সিঁড়ির মুখে আলোয় আরো একবার ঠিকানাটা মিলিয়ে দেখল নিরঞ্জন। ফ্ল্যাটবাড়ী। প্রথমে একবার বাড়ীর নম্বর দেখেই সোজা ওপরে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার কড়া নাড়তে পারেনি। আবারো তাই নীচে নেমে এসে ফটকে লাগানো ঠিকানাটা মিলিয়ে দেখল। ওঠা নামা করে, এতগুলো সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে, এতক্ষণে প্রায় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে।

সার্কুলার রোডের ঠিকানা পাওয়া মাঝে মাঝে দুস্কর হয়ে ওঠে। এক রাস্তার ঠিকানা অন্য গলিতে থাকবে। তাও দু'দিকে নয়। একদিকে একসারের কয়েকখানা বাড়ীর নম্বর মাত্র। ছ'টার সময় পরমেশের সঙ্গে নিরঞ্জন দেখা করবে বলেছিল। এখন আটটা বাজতে চলল তবু এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না সে পরমেশের ফ্ল্যাট এ বাড়ীতেই কি না। পরমেশ অবশ্য বলেছিল, বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া খুব সহজ হবে না : তবু নিরঞ্জন যেন এই কষ্টটুকু স্বীকার করে।

রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের চারপাশ একবার মুছে নিল নিরঞ্জন। তারপর একটু দাঁড়িয়ে, কি ভেবে ফটক পার হয়ে সিঁড়ি ধরে সোজা ওপরে চলে এল। তিন তলায় সিঁড়ির মুখে এসে চারিদিকে তাকাল একবার। যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে হয়ত জিজ্ঞাসা করে নিত। ডান হাতের মুঠোয় পরমেশের ঠিকানা লেখা কাগজখানা ভিজে ব্লটিং পেপারের মত হয়ে গেছে। বাঁ হাতে তখনও রুমালটা। নিরঞ্জনের মনে হল তার হাত দু'টো বাঁধা, কিছুই যেন আর করবার নেই। অসহায়ের মত এদিকে ওদিকে চোখ তুলে ধরল। সামনের দরজাটা বন্ধ। পেছনে সিঁড়ির

বাকী অংশ সোজা ওপরে চলে গেছে। ডান পাশে আধখোলা একটা জানলা। জানলার ফাঁক দিয়ে একটি সংকীর্ণ আলোর রেখা বাইরে এসে থমকে যেন দাঁড়িয়েছে। আলোর সেই রেখায় নিরঞ্জন এবার একটি মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটি হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে, আর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে গুন গুন করে একটি গান গেয়ে চলেছে। হারমোনিয়মের রঙ্গীন রীডগুলোর ওপর মেয়েটির আঙ্গুল-গুলো অনেক ফর্সা, অনেক সুন্দর মনে হচ্ছিল। হয়ত এমনি করে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত নিরঞ্জন। কিন্তু এবার তাকে পিছু ফিরে তাকাতেই হল। পেছনে, সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ। নিরঞ্জন ঘার ফেরাতেই পরমেশ হেসে উঠল। দু'চোখে কৌতুক, বলল :

'বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলি কেন। ডাকতে পারিসনি আমাকে ?'

দু'জনেই হেসে উঠল এবার। পরমেশের কাঁধের ওপর দু'খানা হাত রেখে নিরঞ্জন বলল,

'দাঁড়িয়েই তোর কথার জবাব দেব নাকি ?' তারপর অন্য কথায় কেউ আর ফিরে যেতে পারলনা। নিরঞ্জনের হাত দু'খানা ধরে পরমেশ তাকে ঘরে এনে বসালো।

নিরঞ্জন আর পরমেশ। চারবছর ওরা এক সঙ্গে, এক কলেজে পড়েছে। বি এ পাশ করে বরাত জোরে নিরঞ্জন একটি বিলিতি ওষুধ কোম্পানীর সেলিং রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরী পেয়ে গেল। তারপর ওদের ছাড়াছাড়ি হয়। একজন আর একজনের কাছ থেকে ছিটকে কোথায় চলে যায়। পরমেশ অবশ্য তার পরেও বেশ কিছু-কাল পড়া চালিয়েছিল। এম এ পাশ করার পর এখন খবরের কাগজে কাজ নিয়েছে। সংবাদিকের কাজ। সাব-এডিটর।

ঘরের মধ্যে এসে বসবার পর পরমেশই প্রথমে কথা তুলল। 'বাড়ীটা খুঁজে বার করতে বেশ অসুবিধা হয়েছিল, তাই না ?'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষায় একটু তাকাল। কোনো উত্তর না পেয়ে আবার বলল,

'তবে বাড়ীটা খুব ভাল, আর আশ্চর্য রকমের সস্তা। সম্পূর্ণ আলাদা একটা ফ্ল্যাট। ছাতের একখানা ঘরও এর সঙ্গে পাওয়া গেছে।' এবার মুখে একটু হাসি এনে বলল, 'কিন্তু ভাবতে পারিস, ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা? আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন এখানে। বাড়ী করে চলে গেছেন। আমরাও তাঁর কাছ থেকে পুরনো ভাড়ায় বাড়ীটা পেয়ে গেলাম। রায়টের সময় যখন এ পাড়ায় কেউ আসতে চায়নি, ভদ্রলোক এসেছিলেন তখন। সেই জন্যই হয়ত এতটা সুবিধেয় পেয়েছিলেন।'

অনেক কথা একসঙ্গে বলে পরমেশ থামল। একটু উসখুস করে নড়ে চড়ে বসল। কিন্তু তবু নিরঞ্জন নিরুত্তর। এতদিন পরে দু'জনের দেখা—কিন্তু এই নিরুত্তর পরিবেশে সবকিছুই যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। অনেকখানি বিরতি। অবশেষে হঠাৎ একবার পরমেশ বলল,

'কি রে, তুই কোনো কথা বলবি না নাকি?'

নিরঞ্জন এবার মুখ তুলে হাসল। আর এই হাসির ফাঁকে ভেবে নেবার চেষ্টা করল, কি কথায় উত্তর দেওয়া যায় পরমেশকে।

নিরঞ্জন পরমেশকে দেখছিল। ঠিক আগের মতন যেন সে আর নেই। গায়ের রঙ অনেক, অনেক কালো হয়ে গেছে। তা' আর হবেনা, নিরঞ্জন ভাবে, রাত জেগে কাজ? কিন্তু ভেতরটা তার ঠিক আগের মতই আছে। আগেরই মত উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ। মনে আছে নিরঞ্জনের কলেজে তারা সকলে পরমেশকে 'কথক' বলে ডাকত। তার কারণও ছিল। রাজনীতির বক্তৃতার মত সব সময়েই আর সমস্ত বিষয়েই কথা বলতে পারত পরমেশ।

কথায় কথায় পরমেশ দেখতেই পায়নি অনিমা কখন ঘরে এসে ঢুকেছে। আর হাতে একখানা থালা। তার ওপর দু'কাপ চা।

আর একটা আলাদা প্লেটে খানকয় বিস্কুট। পরমেশের লক্ষ্য হল এই এখন, এতক্ষণে। অনিমার কথা শুনে। থালাখানা হাত থেকে নামাতে নামাতে অনিমা বলল,

'কথা আর বলবেন কখন। তুমিই তো বলছ। আর তোমার কথা তো কথা নয়, খবরের কাগজের ছাপা সংবাদ। এতটুকু ফাঁক নেই।'

কথা শুনে নিরঞ্জন তাকাল অনিমার দিকে। এবার তাকে সে চিনতে পারল। এ বাড়ীতে আজ প্রথমেই সে তাকে দেখেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে, ঘরে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করতে।

ততক্ষণে অনিমা ঘরের অন্য কোণে চেলে গেছে। সেখান থেকে একটা টেবিল সরিয়ে এনে চৌকির সামনে রাখল। চায়ের কাপ দু'টো, এবং বিস্কুটের প্লেটখানা টেবিলের ওপর রেখে বলল,

'শুধু চা-ই খেতে হবে দাদা'।

পরমেশের যেন এতক্ষণে খেয়াল হল, অনিমাকে নিরঞ্জন চেনে না। তাই হঠাৎ, একেবারে কোনো ভূমিকা না করে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল,

'অনুকে তো তুই চিনিস্ না, না? আমার ছোট বোন। কাকার কাছে থাকত। আই এ পাশ করে এখানে পড়বে বলে এসেছে। আর জানিস্, কথায় ও আমার চেয়ে কম যায়না। ওর নাম আমি তাই কথকি রেখেছি।'

দু' চোখে হাসি যেন উপচে উঠল নিরঞ্জনের। কিন্তু ওর হাসি অন্য কেউ বুঝবে কেমন করে। যে পুরু কাঁচের চশমা ওর চোখে।

নিরঞ্জন বলল, 'কথক নাম বোধহয় আমরা তোরই দিয়েছিলাম, ভুলে যাসনি?'

অনিমা হেসে ফেলল। নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন না, তাই তো দাদার অত রাগ। গম্ভীর হবার এত চেষ্টা করেও যখন গম্ভীর হতে পারল না, তখন আমাকে আরো বড় কথক প্রমাণ করার চেষ্টা দাদার।'

এ কথার কোনো উত্তর দিল না পরমেশ। জোরে জোরে বারকয় হেসে উঠল শুধু।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। এবার ওঠবার অনুমতি চাইল নিরঞ্জন। কিন্তু অনুমতি চাইলেই কি পাওয়া যায়। পরমেশ তাকে আরো কয়েক কাপ চা না খাইয়ে, আর অনুর একটার পর একটা,—অনেকগুলো গান না শুনিয়ে ছাড়ল না।

পরমেশের কাছে ছুটি পেয়ে যখন নিরঞ্জন রাস্তায় এসে নামল, তখন অনেক রাত। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেবল মনে হল তার, মন্দ গান করে না অনু,—অনিমা।

চুলগুলো বিস্রস্ত। দু'চোখে সদ্য ঘুম ভাঙার ক্লান্তি। ঘুম থেকে উঠেই নিরঞ্জন 'মারকেট রিপোর্ট' তৈরী করছে। বাইরের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা। ঘরের দরজাটা বন্ধ। মেসের চাকরটা এই মাত্র চা দিয়ে গেল। এখুনি আর কারো ঘরে আসার সম্ভাবনা নেই। রবিবার। মেসের অর্ধেকের বেশী লোক বাড়ী চলে গেছে! চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আর সিগারেটের ধোঁয়ায় অদ্ভুত লাগছিল নিরঞ্জনের। এতক্ষনে কলতলায় লাইন হয়ে গেছে। সকলেরই তাড়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, দুপুরের নিদ্রার প্রস্তুতি শেষ করতে সকলেই ব্যস্ত। সিগারেটে টান দিতে দিতে বেশ রাজ্যসুখ ভোগ করে নিরঞ্জন। ভাবতে তার ভাল লাগছিল, আজ তার আর তাড়া নেই। যখন খুসি সে স্নানে যেতে পারে।

এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে নিরঞ্জনের এমন আলস্য মন্থন ভেঙে গেল। দরজা খুলতেই সামনে দেখে পরমেশ! নিরঞ্জন কোনো কথা বলার আগেই পরমেশ বলে,

'চল আর দেরি নয়। নীচে অনু দাঁড়িয়ে আছে। সকালের শো'য় সিনেমার টিকেট কেনা হয়ে গেছে। একটা ভাল ছবি হচ্ছে।'

কথাগুলো শেষ করে যেন জোর করে টেনে নিয়ে গেল পরমেশ নিরঞ্জনকে।

তারপর শুধু কি সিনেমাতেই শেষ। সিনেমা থেকে সকলে গেল পরমেশের বাড়ি। দুপুরে সেখানে নিরঞ্জনের নিমন্ত্রন ছিল। কিন্তু নিমন্ত্রন রক্ষা করেই সে চলে আসতে পারল না। অপেক্ষা করল বিকেল উত্তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যার জন্য। অনুর গানের জন্য। কিছুই খারাপ লাগেনি নিরঞ্জনের। এক নেশার মত তার কেটে গেল সমস্ত দিন। পরমেশের মার রান্না, অনুর গান, পরমেশের অনেক কথা, সব মিলিয়ে তার অপূর্ব মনে হয়েছিল সমস্ত দিন।

পরের দিন বিকেলে সিনেমার টিকিট নিয়ে হাজির হল নিরঞ্জন। পরমেশকে এবার সে অবাক করে দেবে।

নিরঞ্জনকে দরজা খুলে দিল অনু। এখুনি বোধহয় সে কলেজ থেকে ফিরেছে। ছোট ছোট ঘামের টুকরো কপালের ওপর। মুখে। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠে।

কিন্তু অবাক হল নিরঞ্জনই। শুনল, এ সপ্তাহে পরমেশের ইভনিং ডিউটি। সমস্যার সমাধান অনুই করে দিল। নিরঞ্জনের সামনে এক পেয়ালা চা দিয়ে বলল,

'চলুন, আমরাই যাই। একটা টিকেট না হয় নষ্টই হল।'

নিরঞ্জনের সম্মতির অপেক্ষা না করেই অনিমা চলে গেল পোযাক বদলাতে। নিজেকে তৈরী করে নিতে তার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগল না।

একটু আগেই ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। চৌরিঙ্গীতে পৌছে ঘড়ির সময়ে দেখা গেল, ছবি আরম্ভ হতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। ছ'টার সময় শো। সবেমাত্র পৌনে পাঁচটা। অনুই প্রস্তাব করল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেবার জন্য।

নিরঞ্জনের অবশ্য তাতে তেমন আপত্তি ছিলনা। তবে ভাবছিল, চায়ের দোকানের কোনও একটা কোণ কেমন হত। অনুর কিন্তু এ প্রস্তাবে মোটেই সায় নেই। সে বলল ঃ

'চায়ের দোকানে জবু থবু হয়ে বসে থাকার চেয়ে হাঁটা অনেক ভাল। ঘরের দেয়ালে চোখ আটকে যাবে না। ট্রাম লাইন পার হয়ে একটু এগিয়ে গেলে মাঠ পাওয়া যাবে। সুন্দর, সবুজ মাঠ। আর তারই ধারে কালো পিচ ঢালা রাস্তাগুলো অপূর্ব, নির্জন। ধুলো নেই, হাওয়া আছে। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। গা শির শির করা হাওয়া।'

হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিল অনু।

অনিমার কপালের ওপর অগোছালো এসে পড়া কয়েকটি চুল বাতাসে উড়ছিল। বেড বোডের দিকে ততক্ষণে তারা পা বাড়িয়েছে। উজ্জ্বল দিনের রঙে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল অনিমাকে। নিরঞ্জন অনিমার হাত নেড়ে কথা বলা দেখছিল। চুল ওড়া দেখছিল। রাস্তায় হাঁটার পক্ষে যুক্তিগুলো শেষ করে অনিমা যখন চোখ তুলল, দেখল নিরঞ্জনেব চোখের সঙ্গে তার চোখ এক হয়ে গেছে। নিরঞ্জন তার চোখদুটোকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল। আর স্তব্ধ হয়ে গেল অনিমা। সেই যে সে কথা থামাল, আর কথা বলল না। সেই যে নামাল চোখ, আর তুলল না।

কেমন এক নিঃশব্দ অস্বস্তিতে নিরঞ্জনের মন কেমন ভার হয়ে উঠল।

সিনেমার শো শেষ হয়ে যাবার পর ওরা ট্রাম স্টপেজের দিকে এগুচ্ছিল। রাস্তাটা কিছুদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ এক জায়গায় যেন থেমে গেছে মনে হয়। এত অন্ধকার সেই পরিসরটুকু। অনু মুখতুলে বলল,

'এত ছোট বই। মাত্র আটটা বাজে। চলুন একটু বসি কোথাও। কোনো মাঠে।'

রাস্তা পার হয়ে ওরা কার্জন পার্কে এসে ঢুকলো।

ওরা এসে পার্কে বসেছে। একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে অনিমা তার প্রান্ত ভাগ দাঁতে দাঁতে কেটে চলেছে।

কি যেন ভাবছিল নিরঞ্জন। কি যেন সে ভাবল। পরমেশের কথা তার মনে হল। পরমেশের মার কথা। মনে হল তার, ছবি দেখতে আসা নিয়ে পরমেশ যদি কিছু ভাবে। যদি—কিছু মনে করেন তার মা। এক দ্রুত পট পরিবর্ত্তনের পর তার মন হঠাৎ থমকে এসে দাঁড়াল। নিরঞ্জনের ভাল লাগে অনিমাকে। এ কথা কি পরমেশ বুঝবেনা। আর পরমেশ না হয় না বুঝুক। কিন্তু অনিমা?

কি দিয়ে কথা বলবে? কোন কথা দিয়ে সুরু করবে, যেন বুঝে উঠতে পারেনা নিরঞ্জন। এক অসহ্য স্তব্ধতায় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। চোখদুটো হঠাৎ তার কেমন জ্বালা করে ওঠে। চোখদুটোকে অতি প্রসারিত করে হঠাৎ প্রশ্ন করল নিরঞ্জন অনিমাকে,

'তুমি একটু ভেবে দেখবে অনিমা, আমাদের বিয়ে হওয়া কি সম্ভব?'

অনিমার গায়ে কথাগুলো যেন এক ঝাপ্টা গরম বাতাস ছড়িয়ে দিল। নিরঞ্জনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, তার আলগা শিথিল হাতটা হাতের মুঠোয় জোর করে চেপে ধরে বলল, 'চলুন এখন ফিরি'।

পরেরদিন কলেজে যাবার আগে অনিমা নিরঞ্জনের মেসে এল। একটু বসেই সে চলে গিয়েছে। নিরঞ্জনকে তখুনি একবার বার হতে হয়েছিল। অফিসে। তবে ঠিক হল, কলেজ থেকে অনিমা বাড়ি না ফিরে নিরঞ্জনের এখানে আসবে। এবং সেখান থেকে নিরঞ্জন তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। কিন্তু কথা দেবার সময় কি একবারও

তার মনে হয়েছিল, অফিস থেকে সে আর ছাড়া পাবেনা। সেখান থেকেই সুপারভাইজারের সঙ্গে বর্ধমানে এক এনকোয়ারিতে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে পাটানায়—ট্যুরে।

পাটনায় এসে নিরঞ্জন চিঠি দিল পরমেশের কাছে, আর ছোট টুক্‌রো কাগজে অনুকে লিখল, 'হঠাৎ চলে আসতে বাধ্য হলাম। রাগ কোবনা। মাস তুই পর আশা করছি, আমার এখানকার কাজ ফুরোবে। কলকাতায় গিয়ে তোমায় সব বলব, তখন বুঝতে পারবে।'

ঠিক সময়েই চিঠির উত্তর এলো। পরমেশ এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছে, অনু তাকে সবই জানিয়েছে। চিঠির শেষে এক লাইনে লিখেছে যে, খবরেব কাগজের অফিসগুলোর অবস্থা মোটেও ভাল যাচ্ছেনা।

অনুও চিঠির উত্তব দিয়েছিল অনেক কথায়।

কিন্তু তারপর সব চুপ। নিরঞ্জনেব আব কোনো চিঠির উত্তর এলো না। এমনকি অনিমাও চিঠি দেয়নি। নিরঞ্জন তারপর আব কোনো চিঠি লেখেনি। যখন হাজারীবাগে নিরঞ্জন, তখন অনিমার রি-ডাইরেকট করা একখানা পোষ্টকার্ড পেল, আর সেই সঙ্গে অফিশের একটা টেলিগ্রাম। অনিমার চিঠিখানা খুবই সংক্ষিপ্ত। 'আমরা ভাল আছি। অনেক কাজ সকালে বিকেলে—তাছাড়া, পরীক্ষা সামনেই, তাই সময় মত উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'একটা কথা আজ আপনাকে লিখছি। আগে হলে হয়ত লিখতাম না। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে কথাটা না লেখা ভুল হবে। কার্জন পার্কে সেদিন রাত্রে আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর তখন দিতে পারিনি। আজ দিচ্ছি—বিয়ে আমাদের সম্ভব নয়।'

ঘরের জানালার পর্দা একবার কেঁপে কেঁপে থেমে গেল।

হঠাৎ উত্তেজনায় যেন অনেকখানি রক্ত নিরঞ্জনের মুখে উঠে এল। চিঠিটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে একসময় জামার পকেটে রেখে দিল।

আস্তে আস্তে এবার টেলিগ্রামটা খুলল। টেলিগ্রামটা এসেছে অফিস থেকে। ট্যুর শেষ হয়েছে। কলকাতায় যাবার জন্য তার। অন্য সময় নিরঞ্জনের ভাল লাগত। কিন্তু এবার মনে হল, টেলিগ্রাম না এলেই বুঝি ভাল ছিল। কলকাতার অনেকগুলি ছায়া দ্রুত তার চোখের সামনে এসে মিলিয়ে গেল। নিরঞ্জনের মনে হল, কি হবে কলকাতায় গিয়ে!

কলকাতায় আসার পর দিন কয়েক নিরঞ্জন কোথাও যায়নি। সিক রিপোর্ট করে চুপচাপ মেসে শুয়েছিল। একবার ভেবেছিল, আবার প্রোগ্রাম করে ট্যুরে বেড়িয়ে যায়। কিন্তু এক নির্জন আলস্যে সে কিছুই করতে পারল না।

প্রায় সপ্তাহখানেক পর, একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে সে, তখন দেখল পরমেশও আসছে স্টপেজের দিকে। শরীরটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে, পরমেশও নিরঞ্জনকে দেখতে পেল। তারপর কাছে এসে হাত ধরে বলল,

'কবে এসেছিস এখানে, কিছুই জানাসনিত।'

রাগে জ্বলে যাচ্ছিল নিরঞ্জন, পরমেশ তা বোঝে। তাই হেসে হেসে বলল,

'চিঠির উত্তর না পেয়ে খুব চটেছিস্, তাই না?'

সেখানে আর কোনো কথা কেউ বলল না।

বাড়িতে এসে ওরা সোজা ওপরে উঠে গেল। পরমেশের ছাতের ঘরে। জামা খুলতে খুলতে পরমেশ বলল,

'জানিস, আমার চাকরিটা আর নেই। আগে হলে তেমন ভয় পেতাম না। এবার বেশ ভয় পবারই কারণ ঘটেছে। একসঙ্গে চার পাঁচখানা কাগজ উঠে গেল। আর দেখনা, আগের অফিসের

মাইনে আদায় করতে আমরা এখন মামলা করছি। কোর্ট থেকে আসার পথেই তো তোর সঙ্গে দেখা হল।'

কথাগুলি পরমেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছিল। জামার হাতাছুটোয় তখনও তার হাত। বাকিটুকু শরীর থেকে খুলেছে মাত্র। আড়াআড়ি করে টাঙানো দড়িতে জামাটা ছুঁড়ে দিয়ে এবার নিরঞ্জনের পাশে এসে বসল। নিরঞ্জনের হাতখানা ধরে এর পরে আস্তে আস্তে চাপ দিল। নিরঞ্জনের মনে হল, বিনীতভাবে পরমেশ যেন তার প্রীতির কথাই বলছে।

আবার পরমেশ বলল, 'জানিস, অনু মাঝে রেডিওতে প্রোগ্রাম পেয়েছিল।'

অনুর কথায় নিরঞ্জনের চোখছুটো ছল ছল করে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে—কিছুতেই সে আর অনুর গান শুনতে চাইবে না।

অনেক কথাই এরপর ছু'জনের মধ্যে হল। এ বাড়িতে, অনুভব করল, আগের সেই উচ্ছল উত্তাপ আর নেই। কথার ফাঁকে নিরঞ্জন জানল, অনিমা এখন একটা আফিসে টাইপিষ্টের কাজ নিয়েছে। পরমেশ কথাগুলো বলবার সময় এক সুযোগে বলল, 'বলতে গেলে অনুর আয়েই এখন আমাদের সংসার চলছে। আমি অবশ্য ছু'একটা ট্যুশনির চেষ্টা করছি। তবে এখনও কিছু হয়ে ওঠেনি।'

সিঁড়ি দিয়ে, কথা শেষ হওয়ার পর ওরা নামছিল। নিরঞ্জন ভাবছে, অনু কি এখনও ঠিক আগের মত হারমোনিয়ম বাজিয়ে এই সময় গান করে?

নীচে এসে দাঁড়াতেই অনিমার সঙ্গে তাদের দেখা হল। একটা কুলির মাথায় একটা টাইপরাইটার। তার সঙ্গে কি কথা বলছে যেন ও। পরমেশকে দেখে অনু বলল,

'জান দাদা, হাফ ইয়ার এণ্ডিং। অনেক কাজ জমে আছে।

এক স্টেটমেণ্ট-ই করতে হবে দশটা। টাইপরাইটারটা তাই নিয়েই এলাম। আজ রাত আর কাল সকাল, অফিসে যাওয়ার আগে ঘণ্টা কয়েক খাটলেই হয়ে যাবে। আর তা না হলে আবার তিন চারদিন অটটা বেজে যাবে অফিস থেকে বেরুতে।'

নিরঞ্জনের দিকে এবার তাকিয়ে বলল, 'কবে এলেন ?'

খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর নিরঞ্জনও দিতে জানে। বলল,

'দিন চারেক হবে।'

নিরঞ্জনের মনে পড়ল, এ বাড়িতে তার আসার প্রথম দিনটার কথা। পাশের ঘরে বসে হারমনিয়মের রঙীন রীডের ওপর অনুর আঙুলগুলো খেলা করছে। আর সঙ্গে গুন গুন করে গাওয়া গান।

পরমেশ ততক্ষণে ওপরে চলে গেছে। নিরঞ্জন দাঁড়াল সেই জায়গায়। পেছনে ছাতে ওঠবার সিঁড়ি। ডানপাশে একটা আধখোলা জানালা থেকে সংকীর্ণ একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে।

এতক্ষণে অনিমা টাইপে বসেছে। প্রায় পৌনে আটটা হবে এখন। ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে আলোর একটা রেখা যেন থমকে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই আলোর রেখায় দেখা যাচ্ছে অনিমাকে। কেমন যেন ওর মুখখানা পাণ্ডুর। মাঝে মাঝে বাঁ দিকে তাকিয়ে কপি পড়ছে। সাদা অক্ষরগুলোর ওপর তার আঙুলগুলো যেন সমস্ত আলস্য ভেঙ্গে ছুটে বেড়াবার চেষ্টা করছে।

বলতে কি, এ পর্যন্ত আমরা একই সঙ্গে কাটালুম। কলেজে, হস্টেলের চৌকিতে পাশাপাশি পিঠ দিয়ে। এমন কি চাকরীর উমেদারী পর্যন্ত। কিন্তু এক সঙ্গে থাকলেই আর একযোগে ফল লাভ হয় কই ? তাই আমার আগেই সুধীর আর নির্মল ভাগ্য গুনে চাকরি পেয়ে গেল। আর আমি এখনও সকাল বিকেল ট্যুশনি করেই চালাচ্ছি। তবে এখনও একই সঙ্গে। একই মেসের চৌকিতে পাশাপাশি পিঠ দিয়ে। কিন্তু বলুন, বিপদ আর কোথায় নেই একটু আধটু ? তাই হঠাৎ যদি সুধীর আর নির্মল তাস নিয়ে বসে পার্টনার না পাওয়ায় মুখ ভার করে তবে অপরাধী মনে হওয়া এমন আর বেশী বিপজ্জনক কি ? কারণ আমার দৌড় বড় জোর ব্রে পর্যন্ত। আর তিন জনে ব্রেতেই বা জুত কোথায়। ইস্কাবনের বিবি যে কার হাতে, তা তো চোখ বন্ধ করে, বিন্দুমাত্র মাথা না খাটিয়েই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু আজ যেন সুধীর এমন রসভঙ্গে না-রাজ। যদিও এ যাবত, এতদিন আমার ভাগ্যেই বেশীবার বিবিলাভ ঘটেছে। তবু এ পরাজয়ে বুঝি ওর আনন্দ নেই। সরবে আজ তাই সুধীর ঘোষণা করল, যাকে প্রথম দেখবে, তাকেই আনবে তাসের আসরে। ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চৌকি থেকে লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ও।

সুধীরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশায় এবার আমরা ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এবং বলতে বাধা নেই, বেশ আনন্দেই। দরজা খোলার পর প্রথম যে ব্যক্তিকে সুধীর দেখল, তিনি বারীনবাবু। আর এ মেসের কে না জানে বারীনবাবু তাসখেলা দূরে থাক, বিশেষ কথাবার্তাই বলেন না কারো সঙ্গে। আমি আর নির্মল, দুজনেই

বেশ নড়ে চড়ে, কিছুটা ছড়িয়ে বসলাম। নির্মল আরো কিছু অগ্রসর হল। টেবিলের ওপর পা দুটো সটান চালিয়ে দিয়ে ঘাড় কাত করল।

কিন্তু একটু পরেই বেশ বিচলিত বোধ করলাম। হতাশ হলাম সুধীরের কাণ্ডকারখানায়। হতভাগা এ হেন বারীনবাবুকেও পাকড়াও করেছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম সুধীরের গলা।

'—আরে বারীনবাবু যে। কোথায় চললেন ?'

সুধীরের কথা শুনে কারো মনেই হবেনা যে, এ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের এই প্রথম আলাপ। আর বারীনবাবুর চোখে মুখে কোনো ব্যতিক্রম দেখলাম না, যেমন ভাবে আমরা তাকে রোজ দেখি ঠিক তেমনিভাবেই আবার দেখলাম। শুধু ব্যতিক্রম একটু হাসির। বোধহয় এটুকু শুধু আমাদেরই উপরি লাভ।

'নীচে যাচ্ছি। ঘরে বড় গরম।' বারীনবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'নীচে আর গিয়ে কাজ কি, আসুন কয়েক হাত তাস খেলি। আমাদের ঘরে তেমন গরম নেই। বেশ ঠাণ্ডা।'

অন্তরঙ্গতায় গাঢ় লাগল সুধীরের গলা।

এবার পালা বারীনবাবুর। একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর আমাদের দরজার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন :

'বেশ, চলুন। কিন্তু মশাই ব্রীজ আমার ভালো মনে নেই। কতকাল খেলিনা।'

সুধীর তখন উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে ব্রে-তেই হবে। ব্রীজে কে আর তেমন পণ্ডিত বলুন ?'

এ সময় আমাদের অবস্থা যে কি হতে পারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার আর কি। শুধু ঠিক হয়ে মাত্র বসতে হল। কিন্তু বেচারা নির্মল। আস্তে আস্তে পা টেনে যখন কুঁকড়ে বসল, তখন দেখে কষ্টই হচ্ছিল। আর ওর মত টুকটুকে মুখ যদি ভার

হয় তবে কার না কষ্ট হয় বলুন? কিন্তু এক সুধীরের উৎসাহেই সব আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। জোরে তাস শাফল সুরু হল। তারপর তাস দেখা। দেওয়া।

কিন্তু সুধীরের বিবিভাগ্য হঠাৎ যে এমন ভাল হবে একথা ভাবতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কি আর করা যাবে। ইচ্ছে করেও নিজের ভাগ্যে বিবি গছানোর উপায় ছিলনা আমার। এমন কি নির্মলেরও। বারীনবাবুর কাড লাক ভালোই বলতে হয়। ভদ্রলোক বার বার বিবি পাচ্ছেন, আর নির্বিবাদে খেলার মাঝামাঝি এসে ঠোঁটের কোণে সামান্য হেসে বলেন,

'সুধীরবাবুর এমন বিবি আসক্তি তো মোটেও সুবিধার বোধ হচ্ছেনা। বোঝা যে বেড়েই চলেছে। পরে বইবেন কি করে?' কথা শেষ হতে না হতেই তিনি আস্তে আস্তে সুধীরের পিঠে ইস্কাবনের বিবিটা পাশিয়ে দেন।

এর পরেও কার আর পূর্ববৎ তাসে উৎসাহ থকে। সুধীরেরও তাই হল। হঠাৎ সে যেন কেমন নিরুৎসাহ এবং হীনোদ্যম। আমাদের, অন্তত আমার কথা বলতে পারি, বিশেষ খারাপ লাগছিল না। আমাকে হয়ত স্বার্থপর বলবেন। কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা কিম্বা সঙ্কোচ নেই। সুধীরের এমন তাসপ্রীতি আমার মোটেও বরদাস্ত হয় না। আর আমাদের আসরে যিনি অপরাজেয়। অন্যের কাছে তার কাহিল চেহারা তো মনে হয় সকলেরই ভাল লাগে।

কিন্তু পর পর তিনবার হারার পর সুধীরই আজ তাস সরিয়ে রাখল। তারপর একটু থেমেই বারীনবাবুকে বলল, 'আপনার সঙ্গে এতকাল আমাদের পরিচয় ছিল না, এটা অত্যন্ত লোকসানের কথা। বিশেষ করে আপনার মত এমন একজন পাকা খেলোয়ারের সঙ্গে আরো কিছু ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা না করে পারব না। 'আপনাকে আজ এখনই ছেড়ে দেবনা।' একটু ছেদ। 'আপনি বরঞ্চ আপনার জানা একটা গল্প বলুন। এই মেসে শুনেছি আপনি অনেকদিন।

আমাদের প্রথম পরিচয় অল্পে শেষ করতে খারাপ লাগবে। গল্প দিয়েই তার স্থরু করুন। তাছাড়া রান্নার অনেক দেরী। কোথায় আর এখন যাবেন? অন্তত আপনার অভিজ্ঞতার কোন গল্প বলুন।'

স্থধীর বারীনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

পাশ থেকে বারীনবাবু তাসগুলো সরিয়ে হাতে নিলেন। তারপর মাঝামাঝি ভাগ করতে করতে বললেন,—

'দেখুন গল্প আমি তেমন জানিনা। তবে অভিজ্ঞতার কোন কাহিনী হয়ত শোনাতে পারি। কিন্তু তাকি আপনাদের ভাল লাগবে?'

নির্মল মুখ খুলল এবার। 'খুব, খুব লাগবে। আপনি বলুন।'

'কিন্তু আমার গল্পের কাহিনীর একটা প্রাথমিক ভূমিকা দরকার। সেটা আগে সারি। তারপরও উৎসাহ থাকলে জানাবেন। ভূমিকা আর কিছু নয়। নেহাৎই সাধারণ। আমি আমার এক বন্ধুর ডায়েরী পড়েছিলাম। তারই একটা সবিস্তার কাহিনী আপনাদের বলতে চাই। আর বন্ধুটির ডায়েরীটা আমি অনেকবার পড়েছি। এতবার পড়েছি যে বলেতে পারেন প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, আমি সে লেখা ঠিক ঠিকই বলতে পারবো।'

'এতে আর কার উৎসাহের অভাব হয় বলুন?'

স্থধীর একই কথার মোড়ে আবার ফিরে এল। 'আর ডায়েরী মান্নুষের জীবনের অনেক কথাই জানায়। অনেক না-জানা কথা বলে। আর তা' সকলেরই ভাল লাগার কথা। আপনি বলুন বারিনবাবু। হয়ত আমরা রুশোর কনফেশানের নতুন সংস্করণ কিছু পাব।'

'না, সে রকম কিছু নয়। অত্যন্ত মামুলি। তবু বলছি শুন্থন।'

বারীনবাবু এবার থামলেন। তাঁর ঠোঁট যেন নীচের দাঁতের সারিতে একটু আটকে থাকলো। এতক্ষণ শুধু নীচের দিকে তাকিয়ে তিনি তাসই শাফ্‌ল করছিলেন। এবার থামালেন তাঁর তাস শাফ্‌ল করা। ঠোঁট খুললেন।

'সময়টা বোধ হয় তখন ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাস। তাই হবে। কারণ যখনকার কথা সঞ্জীবন লিখছে, সেটা তার সিক্সথ ইয়ারের সমসাময়িক। তারিখ দিয়ে সঞ্জীবন লিখেছে :

বড় ক্লান্ত লাগল আজ। সন্ধে পর্যন্ত লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করার পর তাই একটু ইচ্ছে হল গোলদিঘীর পার দিয়ে ঘুরি। ফলটা কিন্তু খারাপ হয়নি মোটেও। অনেকদিন পর নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হল। মনে মনে হিসাব করেছিলাম তখন। প্রায় পাঁচ বছর ত হবেই।

নরেশবাবুও মনে হল আমাকে দেখে আনন্দিতই হলেন। অনেক কথাবার্তা হল। চেহারাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে দেখলাম নরেশবাবুর। আর তা না হবারই বা কারণ কি আছে ; বয়স তো আর কম হয়নি। কথায় কথায় জানলাম তিনি পেন্সন নিয়েছেন। সময় হবার পাঁচ বছর আগেই।

নরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলবার সময় কেন যেন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল বারে বারে। একথা কি আমি আজও অস্বীকার করতে পারি, আমার পড়াশুনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আর যখন কোথাও জায়গা নেই, তখন তিনিই ডেকে জায়গা দিয়েছিলেন আমাকে। এমন কি মীরা আর নীরাকে পাড়ানোর জন্য মাসে মাসে হাত পেতে আমি টাকাও নিয়েছি। কিন্তু তবুও ও বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম কেন ? আর আসার সময় কেন নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিনি ? এ প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর কি আমি দিতে পারি আজ ? নরেশবাবুর আত্মীয়রা হয়ত পছন্দ করেননি আমার ওখানে থাকা। কিন্তু তাতে নরেশবাবু অথবা তাঁর স্ত্রী, কেউ কান দেননি কখনও।

তবু আমি চলে এসেছিলাম। তার কারণ আমি এখন জানি। বুঝি। আমি ভীরু ছিলাম। কাপুরুষ।

মীরাকে আমিও ভাল বেসেছিলাম। তার কথার ঠিক সুরে

সুরে আমিও কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু মীরা যখন তার বিয়ের কথায় আপত্তি তুলে আমাকেও নরেশবাবুর কাছে কথা বলতে বলেছিল, তখনই কি হাঠৎ আমি আবিষ্কার করিনি ওখানে থাকা আমার ঠিক নয়?

আমি চলে আসার পর মীরা আর বিয়েতে আপত্তি করেনি। প্রায় মাস চারেক পর, হাতে আমার তখন চারটে ট্যুশন, আই এ পরীক্ষা দিয়ে নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জেনেছিলাম, মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর উঠে-গেলেন চায়ের ব্যবস্থা করতে। আমার ততক্ষণ লক্ষ্যই পড়েনি, নীরা আমার পাশে বসে.ছল। এবার সে ঘনিষ্ঠ হল। বলল:

'আপনি চলে যাবার পর দিদি খুব কেঁদেছিল জানেন।' এবার থামল ও। একবার চারধারে তাকিয়ে নিয়ে আমার হাতে একটা খাম দিল।

'চলে যাবার সময় দিদি এটা দিয়ে গিয়েছিল। আপনি তো ঠিকানা রেখে যাননি। তাই পাঠাতে পারিনি।'

এরপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল নীরা।

আমার গলাটা তখন যেন কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন আটকে গিয়েছিল। নীরা, তার মা, কারু দিকেই তাকাতে পারছিলাম না। কোনোরকমে চা-টুকু শেষ করে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ নরেশবাবুর কাথায় মুখ তুললাম। তিনি বললেন,

'এতক্ষন ধরে তুমি তো আমার কথাই শুনলে। এখন বল, তোমার কথা বল।'

সংক্ষেপে আমার কথা বলে চলে এলাম হস্টেলে। আসার সময় নরেশবাবু তাঁর ঠিকিনাটা আমায় দিলেন। মধুগুপ্ত লেনে তাঁর বাসা।

রাত প্রায় আটটা হবে। কথায় কথায় বুঝতেই পারিনি, কোথা দিয়ে সময় গেল! ট্যুশনিতে আজ আর গেলাম না।

তার পরের তারিখ ১৬ই জানুয়ারীর।

সঞ্জীবন লিখছে, আজ গিয়েছিলাম নরেশবাবুর বাড়ি। সন্ধেটা বেশ ভালই কাটল। কিন্তু অবাক হলাম নীরাকে দেখে। কত বড় হয়ে গেছে ও। অবশ্য আমি যখন ওদের ওখানে ছিলাম, তখন আমার সামনেই ও ফ্রক ছেড়ে কাপড় ধরেছিল। ফ্রকে আব তখন ওকে মানাত না। আর বেশী অবাক হলাম দেখে যে, দিদির কিছুই ও বাদ রাখেনি। তেমন করে কথা বলে। চলে। হাসে। শুধু তফাৎ মীবার চশমা ছিল, সাদা শেল ফ্রেমের চশমা। নীরার নেই।

অদ্ভুত মিল ওদের দু'জনের। দেরী করে ফিরলে যেমন মীরা বলত, 'এত দেরী হল কেন, আমি কখন থেকে বসে আছি।' ঠিক তেমনি-ই ওপরের ঠোঁট চেপে নীরা বলল,

'এতদিনে মনে পড়ল আমাদের সঞ্জীবনদা। মা আপনার জন্য খুব ভাবেন। প্রায়ই বলেন, কোনো ভাবে ঠিকানা জোগাড় করে আপনি নিশ্চয় আসবেন।'

চুপ করল নীরা। তার পর আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে বলল,

'বসুন মাকে ডেকে আনি।'

আমার মনে হল, হঠাৎ ও জোরে চলতে গিয়ে থেমে গেল। আস্তে আস্তে, যেন অনেকটা সাবধানে হাঁটতে আরম্ভ করল। কিন্তু এত মিল কি করে হয়? পেছন থেকে আবকল মীরার মত। এমন কি নীরু মীবার মতই বিনুনী ছেড়ে দিয়েছিল পিঠে।

মীবার চিঠি মনে পড়ল:

'আমার কিছুই কি তোমার কাছে থাকবে না। কোনো চিহ্ন? কোনো কথা? পারবে তুমি অন্য কোনো মেয়েকে ছুঁতে? যে হাত দিয়ে একদিন তুমি আমায় ছুঁয়েছিলে, সেই হাতে?'

২১ শে মার্চ।

পরীক্ষার দেরী নেই। তবু এরমধ্যে, পড়ার ফাঁকে, সময় করে

একবার গেলাম নীরার ওখানে। রাত্রে খাবার নিমন্ত্রনও ছিল। নরেশবাবু একটু তাড়াতাড়ি, সন্ধের আগেই যেতে বলেছিলেন। তাই সন্ধে হতেই গেলাম। নীরা গান করছিল তখন। অনেকদিন মীরাও এমন করে গান করত। আর তা আমাকেই শোনাতো। আমি ওকে একদিন বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'কখন দিলে পরায়ে' গানটা আমার ভাল লাগে। তারপর লক্ষ্য করেছি, প্রায় প্রত্যেকদিন ওই গানটা করত সে। একদিন তো ওর মা রেগেই গিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ

'তোর কি আর কোনো গান নেই মীরা? রোজ কি এক গান। কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল।'

তারপর কয়েকদিন ও গান আর শুনিনি। মীরারও কোনো গান।

আবার একদিন সন্ধেয় ফিরে ও গান শুনলাম। আমায় দেখে মীরা লজ্জায় মাথা নোয়ালো। সামনে দেখি নীরা বসে আছে।

আমাকে মীরার মা বলেছিলেন, 'জান সঞ্জীবন, মীরার আমাদের সুমতি হয়েছে। নীরুকে গান শেখাচ্ছে। কতদিন মতি ঠিক থাকে দেখি?'

নীরাও ওই গানটাই করছিল। সামনে বসে, পাশের ঘরের একটি ছোট মেয়ে। নীরাও কেন এমন করে গান করে। এ গানই!

নরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুনছিলাম নীরার গান। পাঁচ বছর আগের মীরার। এমন এক সময় একজন ভদ্রলোককে দেখলাম। ঘরের সামনে। তিনি এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। সেদিন কোনো কথা হয়নি। পরে পরিচয় হল। নরেশবাবু করিয়ে দিলেন। চমৎকার ভদ্রলোক। বি এ পাশ করে আর পড়তে পারেননি। সংসারের চক্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছেন। মাথার ওপর এই অল্প বয়সেই রাজ্যের দায়ীত্ব। কত আর বয়স! আমার চেয়ে খুব বেশী হলেও এক আধ বছরের বড় হবেন। কিন্তু দেখলে

মনে হবে, তিন চার বছরের। বেশ ভাল লাগল ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে। ভদ্রলোকের নাম সুধীর রায়।

বারীনবাবু এবার এখানে, এই কথার প্রান্তে, একটু থামলেন। সুধীবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার নাম তো সুধীর, তাই না?'

'হ্যাঁ।' সুধীর ঘাড় কাত করল।

আবার সুরু করলেন বারীনবাবু।

তারপরের তারিখটা একেবারে জুন মাসেব। ১০ই জুন।

কাজ থেকে মাস তিনেকের জন্য ছুটি নিয়েছি। আর না নিয়েই বা উপায় কি?

নীরাদের ওখানে গিয়েছিলাম আজ। মীরার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু মীরা কেন এমন হয়ে গেল? এ রকম? চশমা থাকলেও বোঝা যায় চোখ ছুটো কত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওর। ছু'ঠোঁটের পাশে সাদা সাদা দাগ। কেমন যেন বেমানান, অসহ্য রকমের মোটা হয়ে পড়েছে মীরা।

ইতিমধ্যে ছু'টি ছেলেমেয়ে হয়েছে। আরো একটির সম্ভাবনার ঘোষণা ওর দেহের সবত্র স্পষ্ট।

আজ আমার মনে হয় মীরাকে আমি মেরে ফেলেছি। হ্যাঁ, আমি-ই। একটু একটু করে ওকে আমি হত্যা করেছি।

কিন্তু ওকে কি আমি বাঁচাতে পারব! নীরার মধ্যে। নীরাকে কি এমন করে পাওয়া যায়না? মীরার হাসিতে। মীরার গানে। মীরার কথায়, ওর চলায়।

মীরাকে আমি বাঁচিয়ে তুলব!

২০শে আগষ্ট।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল কাল। আজ নীরাদের ওখানে গেলাম। আবার ঠিক হল, নীরাকে আমি-ই পড়াব। এবারেই ওকে দিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দেওয়াতে হবে। নরেশবাবুর কথায় রাজী হয়ে

গেলাম। মীরার সঙ্গে আজ যদি দেখা হত, তবে আমি বলতাম, তুমি আমার কাছে ফুরিয়ে যাওনি। তুমি আছ। নীরার চোখে ওর কথায় তুমি বেঁচে উঠেছ। নীরাকে ছুঁয়ে আমি তোমাকে অনুভব করব। নীরার কথায় তোমাকে আমি কাছে পাব।

কিন্তু নীরার সঙ্গে কেন যেন সহজ হয়ে কথা বলতে পারছি না। ওকি জানে মীরার কথা? আমার ভীরুতার কথা?

২৮শে ডিসেম্বর।

পরীক্ষার রেজাল্ট আজ জানলাম। পাশ করেছি। চাকরীও একটা পেলাম। মোটামুটি চাকুরীটা মন্দ নয়। রেলওয়েতে। একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে।

মাঝে আর কদিন নীরাকে পড়াতে যাইনি। ওর তো আর পরীক্ষার দেরী নেই।

২৯শে ডিসেম্বর।

নীরাকে পড়িয়ে আসার পর নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

তিনিই বুঝি আমাকে আজ নীরার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে এলেন। মীরাকে আমি আর বাচতে পারলাম না।

নীরাকে আমি কেমন করে বিয়ে করব। কি করে নরেশবাবুর কথায় মত দিই?

আবারো বারীনবাবু অন্য কথায় এলেন।

তারপর অনেকদিন পযন্ত সঞ্জীবনের ডায়েরীর পাতা সাদা ছিল। দেখলাম আবার তাতে আঁচড় পড়েছে এপ্রিল মাসে।

২০শে এপ্রিল। ১৯৪৭।

নীরার কাছ থেকে সরে এলেই কি আমি বাঁচব? আবার তবে কেন খুঁজি অন্য কারো মধ্যে মীরাকে। মীরার ছায়ায় কি আমি আর সকলকে চিনতে চাই? খুঁজে পেতে চেষ্টা করি?

কি হবে এমন খুঁজে বেড়ানোয়?

নরেশবাবুর কথায় আমি সেদিন নিজের অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে-

ছিলাম। ভেবেছিলাম দায় উদ্ধারের আবেদন জানাচ্ছেন তিনি। একদিন উপকার করেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার প্রতিদান চাইছেন। আর তাই তাঁর কথার পিঠে কথা দিয়ে মত দিতে পারি নি বোধহয়? এই অসম্মতির বোধ কি আমার চেতন মনের বোধ? আমার কি ভাল লাগে না নীরাকে? শুধু কি আমি মীরাকেই খুঁজে পাই নীরার মধ্যে! একা, একেবারে আলাদা করে নীরাকে নয়! তবু আমার এ বোধ কেন?

আমি হয়ত ভয় পাই! নীরা বললেও পেতাম। নরেশবাবুর কথাতেও পেয়েছি।

আমি কি তবে নীরাকেও ভালবাসি?

২১শে এপ্রিল।

নীরার সঙ্গে আজ কতদিন পরে আবার দেখা করলাম। নীরা আজ আমাকে ডেকে গান শোনালো। যে গান মীরা করত। সুধীরবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। পাশের ঘরেই ছিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ গান শুনিনি। নীরাকে কি আমি চাই না? এ প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আমি আজ চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজের কাছে নয়। নীরার কাছ থেকে। চেয়েছিলাম, অন্তত ও-ও ওর বাবার মত বলুক, 'খুব কি অযোগ্য আমি।'

ওকে নিয়ে তাই বেরিয়ে এলাম।

বাইরে আসার কথা অবশ্য ওই আমাকে বলেছিল। রাত তখন আটটা।

গোলদিঘী নির্জন। হঠাৎ এক হাওয়ার ঝাপটায় গাছের মাথায় মাতামাতি। দিঘীর পাড় আমরা কয়েকবার ঘোরার পর নীরা আমায় একটা চিঠি দিল। অবিকল প্রথম দিনে মীরা যেমন খামে চিঠি দিয়েছিল, তেমন খামে। মীরার মতই বলল:

'অনেক কথা আপনাকে আমার বলবার ছিল। ভাবলাম বলার চেয়ে লেখাই সহজ। তাই লিখে দিলাম।'

আমি কি কথা বলেছিলাম মনে নেই। বুঝি কথা আমার জড়িয়ে গিয়েছিল। নীরার হাত আমি মুঠোয় নিয়ে কি বলেছিলাম। কি কথা, কোন কথা ?........

এই পর্যন্ত বলে বারীনবাবু থামলেন। নির্মল একটু অপেক্ষা করে বলল, 'এ আবার কেমন গল্প। গল্পের একটা নির্দিষ্ট পরিণতি থাকে, কিন্তু এখানে তা কোথায় ? হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।'

নির্মলের দিকে তাকিয়ে বারীনবাবু বললেন,

'তাই নাকি, হঠাৎ শেষ হয়ে গেল !'

সুধীর এবার কথা বলল ঃ

'তুই-ও যেমন নির্মল। এটা একটা গল্প বলার বিশেষ টেকনিক। বিয়ের কথাটা পাঠককেই ভেবে নিতে হবে।

বারীনবাবু এবার আপত্তি করলেন ঃ

'না, না। সে কি কথা সুধীরবাবু। জানেন না লাখ কথা শেষ না হলে আমাদের বিয়ে হয় না।'

সুধীর যুক্তি মানল না।

'দেড় বছরের আলাপে কত লাখ কথা হয়েছে, তার কি ঠিক আছে। আর ডায়েরীতে কি অত কথা লেখা যায় ?'

'তা যায়না ঠিক। আর সঞ্জীবনের ডায়েরী তার পর আর লেখাও হয়নি। তবে এক্ষেত্রে নির্মলবাবুর কথাই সত্যি। কারণ এ গল্পের পরিণতি একটা আছে। আর সেটা বিয়ের পরিণতি নয়।'

চিঠিটা না খুলেই সে রাত্রে সঞ্জীবন আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমরা একই জায়গায় থাকতাম। চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিল আমাকে।

চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

'আমি জানি দিদির ক্ষেত্রে আপনার যে-ভুল হয়েছিল, আমার বেলায় ঠিক তেমন কোন ভুল আপনার হবে না। দিদি তখন আপনাকে বোঝেনি। কিন্তু আমি এখন আপনাকে বুঝেছি। বুঝি।

বাবা আপনার সঙ্গে আমাব বিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমি যে আপনাকে বিয়ে কবতে পাবি না, এ কথা একমাত্র আপনিই বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পাবেন। আমি সুধীবকে বিয়ে কবব। যদি বিয়ে কবি। কিন্তু তাব দেবী আছে।

সুধীবেব মা জানেন, ছেলেব বিয়ে দিয়ে অনেক সময় মেয়েব বিয়েব টাকা পাওয়া যায়। আমাদেব অবস্থা তো জানেন। আব যদিও সে টাকা কোনভাবে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে বাবা তা' নিশ্চয়ই সুধীবকে দেবেন না। আপনাকেই দিতে পাবেন।

আমাব তাতে দুঃখ পাবাব কিছু নেই। কাবণ সুধীবেব মাকে সে টাকা আমিই শোধ কবে দেব। তাই পবীক্ষা দিলাম। পাশ কবলে চাকবী কি একটা পাব না। অন্ততঃ কর্পোবেশনেব স্কুল মাস্টাবী!

আপনি অনেক উপকাব কবেছেন আমাদেব। অন্ততঃ আবো একটি কবলেন আশা কবি। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে বলুন। এ বিয়ে হয় না।'

সঞ্জীবন চিঠি পড়া শেষ কবে বলেছিল।

'যাক বাঁচা গেল। বিয়েব দায়িত্ব কি কম? আব নবেশবাবু জোব কবলে তেমন ভাবে না কবতেও আমি পাবতাম না। হাজার হলেও ওঁব কাছে তো আমি কৃতজ্ঞ। এ বকম ভালই হল।'

'সঞ্জীবনেব কথা আমি শুনলাম। মুখ তাব আমি দেখতে পাই নি। জানেন সুধীববাবু, বলল অবশ্য ভালই হল। কিন্তু এখনও আমি বুঝি নি। সত্যি কি ভাল হয়েছিল?'

তাসগুলো এবাব হাত থেকে চৌকিব ওপব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাবীনবাবু। তাবপব নির্মলেব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন, এবার একটা পাবফেক্ট গল্প হল তো'?

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম শুধুই। বলিনি কিছুই। শুধু একবাব কেন যেন কৌতুহল হল। তাই জিজ্ঞাসা কবলাম, 'আচ্ছা

বারীনবাবু, আপনিও তো ১৯৪৬ সালে এম এ পাশ করেছেন, তাই না ?'

বারীনবাবু এ কথার পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললেন, 'ডায়েরীর গল্পে এ প্রশ্ন অবান্তর।'

তারপর আর অন্য কথায় না গিয়ে বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়ালেন। নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'আজ ঠাকুরের রান্নার এত দেরী কেন ?'

এবার ওখান থেকেও সরে এসে তিনি সিঁড়ির বাঁক ধরলেন। একটু পরেই তার চটির শব্দ মিলিয়ে গেল।

আজ আর মাধুরী কোনো কথার উত্তর করে না। জবাব দেবার আছেই বা কি! তবু বাড়ির আর সকলকে অবাক করে দিয়েও যখন সে চুপচাপ, তখন রান্নাঘরে এসে দু' একজন খোঁজ নিয়ে গেল। মাধুরী কি বাড়িতে না অন্য কোথাও, দিদির এত কথাতেও আজ সে চুপ!

তোলা উনুনে অন্য ভাড়াটের সঙ্গে ভাগ করা রান্নাঘরে রান্না করতে হয় মাধুরীকে। ঘরখানা এখন সে একাই ভোগ করছে। আর একটা উনুনে আঁচ পড়েনা আজ কয়েকদিন। ও উনুনের বৌ হাঁসপাতালে গেছে। ছেলে হবে ওর। নিজের নির্ধারিত এলাকায় বসে আছে মাধুরী। মাঝে মাঝে শুধু কড়ায় তরকারীর ছক ছক, আর খুন্তি নাড়ার শব্দ। ন'টার মধ্যে রান্না শেষ হওয়া চাই। আপিসের তাড়া। আর এখন মাধুরী যখন লেখাপড়া কিছুই করছে না, তখন শিখুক না অন্ততঃ সংসারের কাজ। আটটার সময় বাজার নিয়ে এলেও ন'টার মধ্যে মাছের ঝোল তরকারী রান্না করে দিতে। কেউ তো আর তাকে পটের বিবি করে রাখবে না। অথবা তুলো দিয়ে আলমারীতে। সুরমাই ইতিমধ্যে কথাটা একদিন মাধুরীকে বলেছে।

মাস দুই হয় এখানে এসেছে মাধুরী। এর মধ্যে এমন বহু কথা অনেকবার তাকে শুনতে হয়েছে। আগে হলে হয়ত কান্নায় ভাসিয়ে দিত। সকলের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে মুখ ঢাকতো। কিন্তু এখন আর সে-সব নেই। সেও বড় একটা ছেড়ে কথা বলে না। সমান তালেই মুখিয়ে উঠেছে, বলেছে, কে যে পটের বিবি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ওপর থেকে হুকুম করতে তো বাধা নেই।

সুরমার অসুখের কথা একবারো তার মনে আসে না তখন। প্রথম যেদিন সুরমা মাধুরীর এমন কথা শুনল, তখন সহসা তার সব কথা থেমে গিয়েছিল। ভাবতেও পারেনি, এমন মুখে মুখে জবাব দেবে মাধুরী। আর যাই হোক, সুরমা জানে মাধুরীর মত মেয়ে কথার জবাব দেয় না। তাই আচমকা এমন কথা শুনে সে কেঁদে ফেলল। সেই দিনই বোধ হয় প্রথম। তারপর আর নয়।

কান্নায় ভিজে উঠেছিল সুরমার গলার স্বর।

'তুই-ও আমায় এমন কথা বললি মাধু। না হয় তুই কাজই করিস। তাই বলে আমার দিকে একটু তাকা বনা। আর নাই হোক, আমি তো তোর দিদি।'

অন্যদিন হলে, আগে হলে, মাধুরী মুয়ে পড়ত অনুশোচনায়। এখন অবশ্য সেই সব বোধ তার ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। আগে সে দিদির কথাই মেনে নিত। এমন ভাবে কেন, তার কি আর মুখ নেই। কথা সে জানেনা নাকি? তা মনে মনে ভাবে, বছর বছর ছেলে বিয়োলে এমন কাঁদতেই হয়।

কিন্তু আগে, তার অনেক আগে, দিদিই তাকে কোনো কাজে হাত দিতে দেয়নি। তখন সে দিদির কাছেই থাকত। তবু যদি জোর করে মাধুরী বলেছে:

'আমার কি একটু কাজ করলেও দোষ!' সুরমা তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, বলেছে,—'তোর কাজ শিখে দরকার নেই। যেমন করেই হোক, তোকে তেমন ঘরে দেবো না যেখানে দু'বেলা হাড়ি ঠেলতে হয়।'

এও তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা। কিন্তু তারও আগে মাধুরীর বয়স যখন আরো কম। মাধুরীর মনে পড়ে। অনেক কথা ঢেউয়ের মতন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তার মনে। তখন, তখন সুরমা কেমন ছিল?

সুরমার ওপরেই তখন সমস্ত সংসারের ভার। মার অসুখ।

মাঝে মাঝে এক আধদিন উঠে হয়ত কাজ করেন। কিন্তু তারপরেই পড়ে থাকবেন বিছানায় অন্ততঃ সাতদিনের নামে। তখন থেকেই সুরমাকে সামলাতে হয়েছে সব। রাজেনবাবুর আর কি! তিনি তো মাসান্তে মাইনের টাকাটা দিয়েই খালাস। বয়স আর তার তখন কত? বড় জোর তেরো কি চোদ্দ। তবু সেই বয়সেই তার সজাগ দৃষ্টির পাহারা বসানো ছিল চারিদিকে। সংসারের কাজে মাধুরীর অযত্ন হয়নি কোনদিন। মাঝে মাঝে মনে হত, মাধুরীকে দিয়েই সে তার সময়ের বাকী ফাঁক ভরিয়ে তোলে। সকাল থেকে বিকাল। তারপর রাত। এই সারাক্ষণ সংসারের নানান কাজের ফাঁকে তার পরিচর্যা করেছে সুরমা। এত বাড়াবাড়ি দেখে যদি কেউ আপত্তি তুলেছে তো, সুরমার মুখ ভার। ভার দেখে মনে হয়না বয়স তার এত কম। আর কাজে কোনো কষ্ট আছে। তবু যদি রাজেনবাবু কোনো কিছু বলতেন, চোখ ছল ছল করে উঠেছে তার। থেমে থেমে বলেছে। কান্নার আবেগে অনেক বার তার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়েছে।

'আর কারো জন্যে তো কিছুই করিনা বাবা। এমন কি তোমার জন্যও কিছু করতে পাইনা। মার জন্যও কি কিছু করতে দেবে না আমায়?'

তাড়াতাড়ি অন্য কথায় ফিরতেন তখন রাজেনবাবু। এসব কথা না বাড়ানোই ভাল। চশমাটা হাতে নিয়ে, কাপড়ের খুঁটে কাচ মুছতে মুছতে বলতেন,

'না না, তার জন্য নয়। রান্না তো তুই-ই করিস। বাকী কাজও যদি তোকেই দেখতে হয়, তবে লোক রেখে আর কাজ কি? ঝি চাকরকে সব সময় কাজে কাজেই রাখতে হয়। তাই বলছিলাম।'

এবার সুরমা হাসে। নীচের ঠোঁট উল্টে বলে,

'ইস্ পারবে নাকি আর কেউ আমার মত গুছিয়ে কাজ করতে?'

লেখাপড়া শিখছে না বলে তার দুঃখ নেই। কাজের গর্বে আরো বেশী ভরপুর সে।

শুধু কয়েকদিনের কথা নয় তা'। এমন কি বিয়ের পর পর্যন্ত সুরমা মাধুরীকে কাছ ছাড়া করে নি। নিজের কাছে নিয়ে এসেছে তাকে। এ-নিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি। তবু তা' অনায়াসে উপেক্ষা করেছে। মনে মনে ভেবেছে, কে বুঝবে মাধু তার কে, তার কাছে কতখানি মাধুরী!

তারপর, অনেককাল পর, একদিন সুরমার বিয়ে হয়ে গেল। একটু বেশী বয়সেই তার বিয়ে হল। ছোট ভাইয়ের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। বাড়িতে বউ না এনে কি পরের ঘরে মেয়ে পাঠানো যায়? শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় সুরমা মাধুরীকেও নিয়ে গেল। তারপর থেকে এতকাল সে দিদির কাছেই ছিল। এই মাত্র কয়েকদিন আগে নিজেদের বাড়ি গেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর তাকে এ বাড়িতে আসতে দেয়নি বিমল। তার নাকি এতে অসম্মান হয়। বলেছে, লোকে ভাবে আমি বোনকে খেতে দিতে পারিনা বলেই সে দিদির কাছে থাকে। আর তাছাড়া এ-সংসারেও তো কিছু কিছু কাজ আছে। বোন থাকতে বউকেই সব কাজ করতে হবে, এ কেমন কথা! আর সে তো লাটসাহেব না যে, ঝি রাখবে একটা। বাবার মৃত্যুর পর দুটো বাড়ি যেন দুটো দ্বীপে পরিণত হল। হঠাৎ প্রয়োজন সেই দুই দ্বীপে সেতু বাঁধে। সুরমার আবার ছেলে হবে। আবারো এ বাড়িতে ডাক পড়ল মাধুরীর। তাছাড়া কিছুদিন হয় সুরমাও তাকে আনতে চায়নি। ও এলে নানারকম অশান্তি বাড়ে। ভাড়া বাড়িতে হুজ্জুত তো লেগেই আছে। নতুন কোনো হাঙ্গামায় আর সায় নেই তার।

প্রথম প্রথম মাধুরীকে নিয়ে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। সুরমার তখন ঝি ছিল। কাজ বেশী না থাকায় মাধুরী এ-ও ঘরের ফরমাস খাটত। কারো ঘরে যাওয়ায় তখন আর বাধা নেই। কিন্তু

বয়সটা তার সব সময়েই আর ফ্রকে আটকে থেমে থাকেনি। শাড়ী ধর ধর চেহারায় তাই এ-ঘর ও-ঘর যখন অভ্যাসমত যায়, তখন কেলেঙ্কারীর ভয়ে নাকি সকলের বুক হিম হয়ে যায়। তাদের সকলের ঘরেই ছেলে। অমন গুণধরদের যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় মাধুরীর বেলেল্লাপনায়, তবে অবাক হবার আছে কি? তবে মাধুরী জানে, সুরমাও লক্ষ্য করেছে, অন্য ঘরের ছেলেদের চাল চলন। দূরে দাঁড়িয়ে লুব্ধ কুকুরের মত জিভ চাটবে। সামনে আসার সাহস নেই। আর মাধুরীর আসা যাওয়া নিয়ে আপত্তিটা তাদেরই বেশী। সুরমা তখন বুক বাজিয়ে ঝগড়া করেছে। একে তো টায় টায় চালানো সংসার। তার ওপর বাড়তি লোকেই দুর্ভাবনা। তবু মাধুরীর বেলায় কষ্ট সহ্য করার না হয় যুক্তি-ই আছে। কিন্তু ও আসে যেন হঠাৎ বাড়ির আবহাওয়াটা পাল্টে দিতে।* সুরমাও এই একই কথায় সমর্থন খোঁজে। ক্রমেই তার তেজ কমে এল। সংসারের চাপ বাড়লো। সব সময়ের ঝি এসে ঠেকল ঠিকেতে। সেও তো কতদিনের কথা। সুরমার দু'টি মেয়ে হয়েছে তারপর। মাধুরীর কাপড় পড়া আর নতুন না।

রেশম পোকার মত পুরনো কথার গুঁটি বোনে মাধুরী। দিদির প্রতি তার করুণাই হয়। মনের কাছে সায় চায়। দিদির শরীর বড় খারাপ। অতটুকু কচি ছেলে নিয়ে বুঝি পেরে ওঠেনা। নইলে হাসপাতালে যাবার দিনও তো বাড়ির কাজ সব শেষ করে গেছে! আর অসুখের তো শেষ নেই। কেমন রোগা হয়ে গেছে। মেজাজটা তাই যদি একটু খিটখিটে হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে বলবার কি আছে? আর কি এমন কাজ করে মাধুরী! দু'বেলা রান্না। অন্য হাল্কা কাজগুলি তো এখনো দিদিই করে। ডাক্তারের নিষেধ না শুনেও উঠে দাঁড়ায়। আগে কি সে দেখেনি দিদির কাজ। অথবা এমনও হতে পারে, দিদির মত গুছিয়ে সে কাজ করতে পারে না বলে দিদির এত রাগ।

আজ, অন্য অন্য দিনের মত, সকালে একই সময় ঘুম থেকে উঠলেও নিজেকে অপরাধী মনে করে মাধুরী। মনে মনে ভাবে, এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে কি সংসরেের কাজ চলে ? এসব কারণে সুরমা যদি কিছু বলেই থাকে তাকে, তবে তো তার লজ্জা হওয়া উচিত। কথার আবার জবাব দেবে কি ? হাতা দিয়ে ডাল নাড়তে নাড়তে কেমন যেন হঠাৎ কান্না পায় তার। যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে তার বুকটা।

চারিদিকে তাকিয়ে জামার নীচে বুকে হাত দেয় মাধুরী। মনের উত্তাপে ঘামে ভিজে গেছে চিঠিটা। কাল বিকাল থেকে জামার নীচে রেখে দিয়েছে চিঠিখানা। অবনীর চিঠি। বুকেব নরম মসৃন মাংসে চিঠির শক্ত কাগছে কেমন যেন খোঁচা লাগে। বুকটা টনটন করে ওঠে তার।

অবনীর কথা মনে হয় মাধুরীর। শঙ্করের মেজদার শালা। তাদের চিনত না সে এতকাল। দেখেওনি। এই মাত্র মাস দুই হল কলকাতায় এসেছে। চাকুরীর খোঁজে। এ-বাড়িতে সেই প্রথম তাকে মাধুরী দেখে। সেদিন এসেছিল এমনি-ই কি কাজে, দিদিকে নিয়ে। এখন আসে একা। বিনা কাজে। কথা ছিল না তাদের মধ্যে। এখনও নেই। তবে এখন যেন কথার চেয়ে বেশী অনেক কিছু বলে। প্রথম দিন,—মাধুরীর মনটা সির সির করে উঠল পুরনো আমেজে। প্রথম যেদিন কথা বলল অবনী, মাধুরী মেজেয় মাদুরে আড় বসে বসে যেন কি বই পড়ছিল। সুরমাকে অবনী বলেছিল, বাঃ আপনার বোনের পড়ায় খুব মন দেখছি। কান দুটো গরমে লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আচমকা সে কিছু করে বসল না। হঠাৎ উঠে গেলনা সেখান থেকে। এরকম কথা তো আর নতুন না। সে আরো অনেকবার শুনেছে। আস্তে আস্তে বইখানা মুড়ে, তাকে রেখে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। যাবার পথে শুনল অবনী বলছে ঃ

'আপনার বোন তো ভারী লাজুক সুরমাদি।'

জবাবে ভ্রূ কুঁচকে কথাটা মেনে নিয়েছিল।

'হাঁ, বড় লাজুক ও।'

সেদিনও কিছু ভাবেনি মাধুরী। দাদার আর আর বন্ধুদের মতই তাকে মনে হয়েছে। যারা মাঝে মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে। কোনো অবকাশে হয়ত রসিকতা করে হাসবে। বড় জোর সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইবে একদিন। এর চেয়ে আলাদা যারা, তারা হয়ত কবিতা লিখে বই উপহার দেবে। বাড়ির অন্ধকার পথটুকু এগিয়ে দেবার জন্য বলে সচেতন ভাবে গায়ে হয়ত হঠাৎ গা ঠেকাবে। এর বেশী আর যেন কিছু করবার নেই তাদের। সাহসও নেই। এটুকু লাভেই তারা খুসী। আরকিছু না দিলে চলে যাবে। প্রশ্রয় পেলেও ওইটুকুই। কিন্তু অবনীর চিঠি যেন দূরত্বের সমস্ত সংশয় ঘুচিয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। অবনী লিখেছে :

'দূরেই যদি থাকবে, তবে হঠাৎ কাছে এলে কেন?'

তারপর আরো অনেক কথা। অস্পষ্ট কুয়াসার মত।

কান্নাটা মাধুরীর থেমে গেছে। কেমন যেন বসে থেকে থেকে থমথমে ভাব এসেছে শরীরের রেখায়। নীচে রান্নাঘরের পাশে বাথরুমের গঙ্গাজলের কলটা অনেকক্ষণ ধরে খোলা। অশ্রান্ত জল পড়ে কেমন যেন শীত শীত লাগে। এলোমেলো কাপড়ের স্তূপে নিজেকে শৈথিল্যে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে মাধুরী। বর্ষণ ক্লান্ত শ্রাবণদীঘির মত থম থম করছে তার মুখ।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলে, কখনও চিৎকার করে, কখনও কেঁদে, এবার সুরমা থামে। আজ সে-ও অবাক। বাকী হাতের কাজ দু' একটা সেরে রান্নাঘরে সে আসে। মাধুরী তখনো বসে লেপা উনুনের সামনে। কাপড়টা তার বড় ময়লা হয়ে গেছে। বয়সের মেয়েকে ময়লা কাপড়ে সহ্য করতে পারে না সুরমা। নিজের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন লাগে তার। মাধুরীর কাছে সরে আসে,

একেবারে পাশে। চমকে যাওয়া মাধুরীকে বুঝি তার চমক ভাঙাতেই জিজ্ঞাসা করে ঃ

'কি এমন করে বসে আছিস্ ?'

এমন হঠাৎ প্রশ্নে চোখ বড় বড় করে তাকায় মাধুরী সুরমার দিকে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর এই প্রথম সে নীচে নামল। অন্যদিনের লাগসই জবাবটা আর মাধুরীর মুখে আসে না। তা'হলে অনায়াসেই বলে দিত তাতে সুরমার কি ? আজ যেন সে কেমন ভয় পায়।

'সব কাজ তো হয়ে গেছে দিদি। রান্নারও কিছু বাকী নেই। আর কিছু করতে হবে ?'

কথার সবখানি শেষ করতে পায়না মাধুরী। মুখটা তার চাপা দিয়ে দেয় সুরমা।

'তোকে আমি বড় খাটাই, না-রে মাধু'

'না, না।' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে মাধুরী।

'তোমার অসুখ, পারনা। তাই তো আমি করি। আর—'

'থাক। আজ বিকেল থেকে মাধু আমি-ই রান্না করব।'

কেমন যেন লাগে মাধুরীর। আজকেই কি চলে যেতে হবে তাকে ? অবনীর চিঠির উত্তর তাহলে সে দেবে কেমন করে ? ও-বাড়িতে তো সে যায় না। মাধুরী আর কিছু না ভেবেই বলে, হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে বলে,—

'আমি আজ কি বললাম যে, তুমি আজকেই আমাকে চলে যেতে বলবে !'

কথা শুনে সুরমার বড খারাপ লাগে। মাধুরী যেন কিছুই বুঝতে চায় না। ঠিক ছোটবেলার মত তাকে কাছে টেনে আনে, বলে,

'না তোকে পাঠিয়েও দেব না। আর তোর কাজও করতে হবে না। আমাব কাছেই তুই থাকবি মাধু, যেমন আগে থাকতিস্। দু'বেলা আমাদের দু'মুঠো জুটলে তোরও জুটবে।'

তারপর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করে সুরমা।

'থাকার তো আর অন্য অসুবিধা কিছু নেই। না হয় একঘরেই সকলে থাকলাম। এক, এই একটা মানুষের সামান্য দেড়শ টাকা আয়ে চলে না বলেই তো তোকে রাখতে পারিনা।

রাত্রে সবাই ঘুমুলে বইয়ের ফাঁকে কাগজ রেখে চিঠি লেখে মাধুরী। বইখানা দিনকয় আগে অবনী দিয়ে গিয়েছে। বুকের নীচে বালিস চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লিখছে। লিখতে লিখতে কেমন যেন বুক কাঁপে। বেশী লিখতে পারে না।

ছোট্ট চিঠি :

'আমি তো তোমারই। কাছে নেওয়া তো তোমারই ওপর। আমায় এবার তুমি নাও।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে রেখে দেয় বইয়ের মধ্যে। কাল আবার অবনী আসবে, বইখানা নিয়ে যেতে। বালিসের নীচে বই-খানা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে মাধুরী।

চিঠিখানা পাবার পর দু'তিন দিন আর অবনী আসে না। এমনি নতুন না। কিন্তু এখন যে তা' বড় বেশী। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে মাধুরীর। মনে সান্ত্বনা খোঁজে, রাত্রে একটা ট্যুশন আছে, তাই বুঝি আসতে পারে না।

তারপর একদিন বিকেলে অবনী এল। মাধুরী ঠিক করেছিল কথা সে বলবে না। আসতেই ঘর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছিল। সুরমা ঘরে নেই। অবনী মাধুরীর হাত টেনে বলে,

'চলে যাচ্ছ যে ?'

মাধুরী : 'তবে কি করব ?'

জবাব পেয়ে একটু থামে অবনী। মনে মনে ভাবে কি করে বোঝাবে সে এ ক'দিন কেমন করে কেটেছে তার। আজ সব ঠিক করে জানাতে এসেছে সে।

এক সওদাগরী অফিসে কাজ করে অবনী। মাইনে মাত্র

পঁচাত্তর টাকা। তা থেকে বাড়িতে পাঠাতে হয়। এখানে খরচ আছে। আর যে টাকা থাকে, তাতে দু'জনের চলবে কি করে? মাধুরীর চিঠি পেয়েও তাই থমকে দাঁড়াতে হয় তার। প্রথম কত রঙীন লেগেছিল। কিন্তু ভাবনার অতলে সব রঙ উবে যেতে চায়। অনেক ভেবে চিন্তে আজ ঠিক করেছে শেষ পর্যন্ত, সর্টহ্যাণ্ড শিখবে। শুনেছে এখনও নাকি ওদিকে তত ভীড় জমে নি। চাকুরী পাওয়া যায়। মন দিয়ে পরিশ্রম করলে এক বছরেই কোর্স শেষ করা সম্ভব। এমন একটা কিনারা পেয়ে মন ভরে উঠেছে তার। আজ কি-না মাধুরী কিছুই শুনেত চায় না!

অবনী: 'রাগ করো না মাধু, আসতে দেরী হল বলে। আজ সব ঠিক করেই তোমার কাছে এসেছি। জান তো আমার আয়। আমাদের বিয়েই সব নয়। অন্ততঃ খুব সাধারণভাবে চালানোও তো চাই। কিন্তু আমার যা' আয় তাতে—'

মাধুরীর আরো ঘনিষ্ঠ হয় অবনী।

'তোমাকে আরো অন্ততঃ এক বছর অপেক্ষা করতে হবে মাধু। সর্টহ্যাণ্ড টাইপ স্কুলে এ্যাডমিশন নিয়েছি। শিখতে পারলে মাইনে বাড়বে। এ কটা দিন পারবে না?'

আস্তে আস্তে ঘাড় কাত করে মাধুরী। যেন এমন করা ছাড়া আর তার অন্য উপায় নেই। আরো কত কথা বলল অবনী। কিছু তার কানে যায়নি। শুধু মনে হয়েছে সর্টহ্যাণ্ড টাইপ কি আরো কম সময়ে শেখা যায়না। আর সত্যি কি ভাল চাকরী হয় তা শিখলে। আর সে বুঝি ভাবতে পারে না। কোনক্রমে আশা বাঁচিয়ে রাখে।

সুরমা ঘরে আসতে নীচে চলে এল সে। অবনীও সুরমার সঙ্গে দু'একটি কথা বলে চলে যায়। রান্নাঘরে এসে বঁটি পেতে কুটনো কুটতে বসেছে মাধুরী। উনুনে ডালের কড়া। সন্ধে হয়ে গেছে।

সদর দিয়ে আসতে আসতে যেন বাড়িটা মাথায় করে তুলেছে শঙ্কর। হাতে তার একখানা রঙীন তাঁতের কাপড়। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে মাধুরীকে দেখে বলে।

'দেখ মাধু, তোমার কাপড় দেখ। পছন্দ হয় কিনা!'

চোখের কোনায় কোনায় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মাধুরী উঠে আসে।

'তোমার দিদি বলেছিল, তোমার না কি কাপড় নেই, তাই আজ নিয়ে এলাম। তোমার দিদির আবার যেমন। মুখ দিয়ে কথা বাব করার পর আর তর সইবে না। দেখ বাপু ভাল করে, পছন্দ হয় কিনা?'

সাদাসিধে ভালমানুষ শঙ্কর। সত্যিই ঘেমে গেছে এত কথা বলতে।

'আপনি তো একেবারে ঘেমে গেছেন।'

'আমার আর অপরাধ কি। তোমাদের কাপড় কেনাও তো ঝকমারি। খোল ভাল হয় তো পাড় পছন্দ হয় না। আবার পাড় পছন্দ হয় তো খোল খারাপ। তারপর আবার রঙ আছে। প্রায় পঞ্চাশটা দোকান ঘুরে কিনে আনলাম এখানা।'

শঙ্কবের ব্যস্ততা তখনও কাটেনি। ভাব দেখে মাধুরীর হাসি পায়। হাসি চেপে বলে,

'যান, ওপরে যান। দিদিকে দেখান গিয়ে।'

কোলের কাছে কাপড়খানা টেনে এনে নেড়ে চেড়ে দেখে সুরমা। প্রথম একটু খুঁত খুঁত করে। কিন্তু পরে মত দেয়।

'বেশ হয়েছে। কিন্তু দাম কত?'

'তুমিই বল। দেখি ঠকেছি না জিতেছি।'

নিজরে শরীর নিয়েই ব্যস্ত সুরমা। অত কথা ভাল লাগে না তার।

'কি জানি কত। অতশত বলতে পারি না বাপু। তবে বেশী না হওয়াই ভাল। এ মাসে খরচ অনেক।'

এতক্ষণে সম্বিৎ ফেরে শঙ্করের। রসিকতা ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে।

'না বেশী কিছু নয়। পনের টাকা নিয়েছে মাত্র।'

শঙ্করের কথা শুনে সুরমার কোটরাগত চোখদুটো কপালে ওঠার যোগাড়।

'এ্যাঁ, পনের টাকা! আর এই তোমার কম। একখানা সাধারণ শাড়ী আনতে বলেছিলাম। আর তুমি খরচ করে এলে পনের টাকা!'

হিসেবে শঙ্করও বুঝি কম যায় না। চোখ সঙ্কুচিত করে হিসেবী হওয়ার চেষ্টায় সুরমার খুব কাছে সরে আসে। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,

'আমাকে তুমি এতই বেহিসেবী মনে কর।' তারপর একটু থেমে, 'আরে একটা ঝি রাখলেও তো এর চেয়ে বেশী খরচ পড়ত তোমার।'

রক্তবিন্দু

এক একটি দুপুর অসম্ভব নির্জন মনে হয় সুলতার। বিশেষ করে সেই সব দিন, যখন আকাশ নীল থাকে। জানালা খুলে বাইরেও তাকানো যায় না তখন। বাইরের রোদ ক্রমে ঘরে ঢোকে। সুলতা দরজা বন্ধ করে একা একা শুয়ে থাকে। বার কয় এ-পাশ ও-পাশ করে হয়ত কখনও উঠে পড়ে বিছানা থেকে। একটু আধটু যা হাতের কাজ, তা চারটে থেকে আরম্ভ করলেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে, দশটা থেকে ঢিমে তালে যে-দুপুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যায়, তার আলস্য ভাঙতে কিছুতেই পারে না। দিনে ঘুম আসেনা সুলতার। ঘুমিয়ে যে কাটিয়ে দেবে, তারও উপায় নেই। এমন কি বই অথবা খবরের কাগজ পড়তেও ভাল লাগে না।

তবু বলতে হবে ভাগ্যের কথা। সব দিনই তেমন অসহ্য দুপুর থাকে না। এমন সব দিনে ছাতে এসে সে দাঁড়ায়। দেখে সাদা মেঘের টুক্‌বো সমস্ত আকাশ জুড়ে ঘুড়ির মত উড়ে চলেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে হয়ত তাই দেখে। তাবপর নবনীর গেঞ্জী, ইজিপ্সিয়ান কটনের আণ্ডারউইয়্যার, রুমাল উল্টেপাল্টে দেয়। ছায়া থেকে সরিয়ে আনে রৌদ্রে। হাতে দলা পাকিয়ে অনুভব করে কেমন নরম নরম। এমনি করে অন্তত কিছু সময় তার কাটে।

এই বাড়িতে, পাঁচ ঘর আর তিন ভারাটের, এই ছোট বাড়িতে সুলতারা মাত্র এই একমাস হয় এসেছে। বাড়িটা একটা মাঠের ওপর। কাছাকাছি আর বাড়ি নেই। কোথাও যাবে, গল্প করবে কোথাও গিয়ে এমন উপায়ও নেই। আর এ-বাড়িতে, যদিও তাদের

নিয়ে তিন ভাড়াটে, তবু কারো ঘরে বউ মেয়ে নেই। একতলায় অপর দিকে থাকেন নিভানন বাবু। তুটো দিক আলাদা করা হয়েছে উঠানের মাঝামাঝি একটি পাঁচিল তুলে। মাঝখানে দরজা। ইচ্ছে হলে একদিকের লোক অন্যদিকে যেতে পারে। কিন্তু না গিয়েও একদিকের লোক অন্যদিকের বাসিন্দাদের অনায়াসেই দেখতে পারে। পাঁচিলটা শেষ হয়েছে চৌবাচ্চার মাথার ওপর। এক চৌবাচ্চার শরিক তু' ভাড়াটেই। পাঁচিলের গহ্বর দিয়ে তাই পাখির চোখে দেখার মত সব কিছুই দেখা যায়। কিন্তু নিভাননবাবুর বাড়িতেও এখন কেউ নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রী বাপের বাড়িতে। বাকী থাকে ছাদের এক ঘরের বাসিন্দা নিশানাথ। সে আর তার মা। নিশানাথের মাসের অর্ধেক কাটে বাইরে। সেই সময় ঘরে তালা বন্ধ। নিশানাথের মা চলে যান মেয়ের কাছে, শ্যামবাজারে। একটু গল্প করবে, কথা বলবে, এমন কেউ নেই সমস্ত বাড়িতে। অসহ্য লাগে স্থলতার। মাঝে মাঝে রাগ হয় তার নবনীর ওপর। আর কোথাও সে বাড়ি খুঁজে পায়নি?

তবু এ তুঃসহ নির্জনতা অনেকটা মানিয়ে নিয়েছে স্থলতা। ছাদে ভিজে কাপড় শুকিয়ে, আকাশের মেঘ দেখে, ঘরের কাজ করে কোনোরকমে তার দিন পার হয়ে চলেছে। শুধু এক একটা দিন তার অসহ্য নির্জন মনে হয়। তখন অনেক কথা তার মনে হয়। নানা দিনের নানা রঙের কথা।

ঘড়ির কাঁটা যখন চারটের ঘরে, তখন আর এ অস্বস্তি থাকে না। একদিকের কাজ সারে ঝি। অন্যদিকে স্টোভ ধরিয়ে সে খাবার করতে বসে। রোজই একরকম নয়। কোনোদিন নিমকি, কোনোদিন অন্য কিছু। বিয়ের ঠিক পরে পরেই একদিন নারকেলের পুর দিয়ে সিঙ্গাড়া বানিয়ে অবাক করে দিয়েছিল সে নবনীকে। নবনীও ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় পা ফেলে। সাড়ে পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে সদরে কড়া নাড়ার শব্দ। আর

সুলতা সে-শব্দ শুনে অনায়াসেই বলতে পারে, দরজার অপর দিকে কে দাঁড়িয়ে।

নবনীর একটু বিশ্রামের পর দু'জন মুখোমুখি বসে চা খায়। গল্প করে। আর এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। দিনের আলো সরে যায়। এই সময়টাই সবচেয়ে ভাল লাগে সুলতার। গা ধুয়ে, কাপড় বদলে সে তৎক্ষণে তৈরী। নবনীও। তারপর বেরিয়ে যায় তারা। কোনোদিন বন্ধুর বাড়ি। কোনো দিন সিনেমায়। আবার একদিন আউটরাম ঘাটের স্ট্র্যাণ্ড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। সেদিন ওদের চড়ুই ভাতি। বাইরে থেকে খেয়ে আসে না। এমন কি খাবারও কিনে আনে না। শাড়ি বদলে, ঘুমে ভারি হয়ে আসা চোখের পাতা দুটোকে কোনোরকমে টেনে টেনে খুলে রাখে। স্টোভটা হয়ত নবনীই ধরিয়ে দেয়। একটা কিছু রান্না করে খেয়ে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে তারপর। রাত হয়ত তখন একটা। নিভাননবাবু ওদের দেখে মুখ বিকৃত করেন। তাঁরও খাওয়া শেষ হয় অনেক রাত্রে। গৃহিণী অবর্তমানে তিনি স্বপাকান্ন ভোজন করেন। রাত্রেই সব ধুয়ে মুছে রাখেন—যাতে সকালে কোনো অসুবিধা না হয়। অল্প জল দিয়ে বাসন ধোয়ার মৃদু শব্দ তাই অত রাত্রেও শোনা যায়।

সকালে উঠে, আবার সময় এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতার অস্বস্তি বাড়ে। বিয়ের পর তাদের এই চার বছরের জীবন এমনি করেই এগিয়ে চলেছে। শুধু বুঝি কিছুদিনের জন্য এ-বাড়িতে আসার আগে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। এর আগে যখন অন্য বাড়িতে ছিল ওরা। বিয়ের ঠিক পরে পরেই। অনেকদিন তার এমন করে দুপুরগুলি একা একা কেটেছিল। বছরখানেক পার হবার পর ওদের পাশের ফ্ল্যাটে একজন নতুন ভাড়াটে এল। ভদ্রলোকের বউটি চমৎকার। কথায় কথায় সুলতার সব কিছুই যেন জেনে নিয়েছিলেন। একদিনের আলাপেই ঘরের সব কথা, এমন কি সুলতারও।

বিকেল গড়িয়ে আসায় দুজনেই ভঙ্গ দিলেন। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, কাছাকাছি স্কুল কোথায়?'

সুলতা বড় লজ্জা পেয়েছিল এই কথায়। বাড়ির বাইরে সে যায়। কিন্তু স্কুলের কথা তার কখনও মনে হয়নি। মুখ নামিয়ে, নখ খুঁটতে খুঁটতে তারপর হঠাৎ খুব অপ্রতিভের হাসি মুখে টেনে বলল, 'কই আমিও জানি না।'

এই উত্তরে নতুন ভাড়াটে গিন্নীও অবাক কম হননি। 'কেন আপনার বাচ্চা স্কুলে যায় না?'

কথাটা শুনে সুলতার খারাপ লেগেছিল। তার বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছরের কিছু বেশী। আর তাকে দেখে কি মনে হয়, স্কুলে-যাওয়া-বাচ্ছার মা সে? তবু একই নরম গলায় উত্তর করল, 'আমার বিয়ে তো হয়েছে এই বছরখানেক মাত্র।'

'ওঃ।' এবার যেন শুধরে নেন নতুন ভাড়াটে গিন্নী। লজ্জা তিনিও বুঝি কম পান নি। প্রসঙ্গটি আরো আন্তরিক আর লঘু করে দেবার জন্য বললেন, 'আমার কিন্তু ভাই দুটি। বড়টির কথাই ভাবছিলাম। ও এই ছ'-এ পড়ল। এত দুষ্টু হয়েছে যে অতিষ্ঠ করে মারে। দুপুরে যে একটু ঘুমুবো তারও জো নেই। তাই স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।'

ততক্ষণে সুলতার চোখ বারান্দা পার হয়ে যেন আকাশ ছুঁয়ে চলেছে। সেখান থেকে চোখ নামিয়ে কেমন শীতল গলায় সুলতা বলল, 'কই ওরা কোথায়? এত দুষ্টু বলছেন, অথচ এ-পর্যন্ত একটুও তো টের পেলাম না!'

'ওরা তো নেই এখানে। বাসা পাল্টাবার হাঙ্গামায় ওদের আমার দেওয়ের বাড়ি রেখে এসেছি। তা না হলে টের পেতেন এতক্ষণ!'

কয়েকদিন পরে ওরা এলে সুলতা টের পেল সত্যি। তবে ওদের মা কিছু বাড়াবাড়ি করে বলেছিলেন। এক পল্টনই একটু

ছুষ্টু। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। এর মধ্যে টাইমপিস ঘড়িটায় চাবি দিতে গিয়ে স্প্রিং-টা নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু তিতিল, তিতিলের কথায় শিরায় শিরায় বিদ্যুতের ঢেউ খেলে। পল্টন সকালেই বাবার সঙ্গে স্কুলে যায়। আর ফেরে সেই চারটায়, বিকেলে। তখন আর তাকে তেমন সময় দিতে পারে না সুলতা। এমন কি তিতিল, যে-তিতিল সেই দশটা থেকে সুলতার কাছে থাকে—তাকেও চলে আসতে হয়। কারণ একটু পরে নবনী ফেরে। তার খাবার করা ও আরো নানা কাজে বিকেলেব ওইটুকু সময় সে ব্যস্ত।

দুপুরের বাকী সময় সুলতাব তখন আর তেমন নির্জন লাগত না। সকালেই তিতিল তার ঘরে আসে। আর রীতিমত নিমন্ত্রণ পেয়েই সে এখন আসা যাওয়া করে।

ভাড়াটে গিন্নীর সঙ্গে আলাপের দু' একদিন পরেই সুলতা দেখল, তিতিল সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। রোজই অফিস যাওয়ার সময় সুলতা নবনীকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। এর আগে কাউকে দেখেনি সে কোনোদিন। এই প্রথম একটি মানবককে দেখে সে একটু দাঁড়াল। তিতিলেব দিকেই সে চেয়েছিল। কিন্তু তিতিল, তাব চোখ নাক টোপা টোপা গাল নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখের ওপর মাথাব চুলগুলি সব নেমে এসে চোখ ঢেকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিতিল বেশ সপ্রতিভ। মুখের দিকে তাকিয়েই বলল সে সুলতাকে। তার ভাঙা ভাঙা কথায়।

'তুমি ভাল না। আমাকে ডাক না কেন?'

চোখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল সুলতাব এবং সেই সঙ্গেই সে তাকে নিমন্ত্রণ জানাল।

কিন্তু তিতিল কি এত সহজে আসে! কথার আর উত্তর না দিয়ে সে তাদেব ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দুপুরে কি যেন করছিল সুলতা। কোনো কাজ ছিল না হাতে।

তবু অলস সময় কাটাতে বুঝি কোনো একটা কাজ খুঁজে বার করার চেষ্টা। এমন সময় দরজায় আল্গা হাতে কার ধাক্কা শুনে সে দরজা খুলে দিল। বেশ সপ্রতিভ তিতিল, 'মা বলল তোমার এখানে আসতে। মা ঘুমোবে।'

বেশ বুঝতে পারে সুলতা, দুষ্টু ছেলের হাত এড়াতে তিতিলকে তার মা এঘরে চালান করে দিয়েছেন। মনে মনে একটু বিরক্তই হয় সে। কিন্তু তিতিলের এ-সবের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই। সে সোজা ঘরে ঢুকে, পরিপাটি করে গোছানো সাজানো ঘরে ঢুকে, সাদা বিছানায় উঠে গিয়ে বসল। এ-ঘরের এমন ছিমছাম ভাব সব সময়েই। কোনো ছোট ছেলে নেই বলে কদাচিত বিছানার পাট করা চাদর কুঁচকোয়। টেবিলের ঢাকনাটা এলোমেলো হয়ে থাকে। ছাইদানটাও যথাস্থানে না থেকে অন্য কোথাও পড়ে থাকে।

এমন পরিপাটি ব্যবস্থায় তিতিলও কেমন অস্বাভাবিক বোধ করে। একটু বসে, চোখের ওপরে নুয়ে পড়া চুল দু'হাতে সরিয়ে চারিদিক একবার দেখে নিল সে। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই আমি, তোমার ঘর নোঙরা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ যেন হোঁচট খায় সুলতা। ঠিক মনে মনে এই কথাগুলিই ভেবেছিল সে। এই শিশুর কাছেও তাই তার অস্বস্তির সীমা নেই। জবাবদিহি করার সুরেই সে তিতিলের পাশে বসে পড়ল।

'হলই বা ঘর একটু নোঙরা। আবার তো পরিষ্কার করা যাবে। তুমি বস।'

কথাগুলি বলে সে পাশের ঘরে গেল। বিস্কুট অথবা আর যা কিছু খাবার পাওয়া যায় হাতের কাছে আনতে।

সেই প্রথমদিন একটু বিরক্ত হয়েছিল সুলত ঠিকই। তারপর আর হয়নি। এখন তিতিল তার ঘরে ঠিক সকালবেলা গুটি গুটি চলে আসে। অনেকদিন সুলতাই তাকে স্নান করায়, খাবার দেয়। তারপর অনেক দুপুরে—এখন আর নির্জন নয়,—পরিশ্রান্ত দুপুরে

তাকে নিয়ে শোয়, গল্প করে। সুলতার বুকের কাছে ঘন হয়ে, কখনও মুখ লুকিয়ে সে শোনে। কখনও ঘুমিয়ে পড়ে।

নবনী মাঝে মাঝে দেখে খুশী হয়। যদিও মুখে বলে, তিতিলকে তার বড় হিংসে, তবু তার এই খুশীর ভাব মোটেও প্রচ্ছন্ন নয়। খুশী হয় এই ভেবে যে, সুলতার দুপুর আর তত নির্জন নয় এখন। বেচারা একেবারে হাঁফিয়ে উঠত।

অনিয়মও কিছু হয়েছে এই সঙ্গে এবং এতদিনের অভ্যাসের একটু বদল ঘটেছে। অনেকদিন সন্ধ্যায় আজকাল তারা আর বার হতে পারে না। সমস্ত দুপুর তিতিলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সুলতা। ঘরের কাজে হাত দিতে পারে নবনীর ফিরে আসার পর। তখন কাজ সেরে বেড়াতে যাবার আর উৎসাহ থাকে না। বরং তিতিলের সঙ্গে গল্প করে, হেসে তামাশা করে সময়টা ওদের কেটে যায়।

সুলতা এই নিয়েই ব্যস্ত এখন। তিতিলের জামা বানানো, সোয়েটার বোনা, তার জন্য খাবার করা। মধ্যে একদিন তিতিলকে নিয়ে চিড়িয়খানায়ও গিয়েছিল সে। তাবপর তিতিলের সেই চিড়িয়াখানার গল্প অনেকদিন, অনেকবাব নবনীর কাছে করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা নানাভাবে, নানা রঙ দিয়ে। সম্প্রতি সে তিতিলের জন্য ছবির নানা রঙের বই কিনে এনেছে। দুপুরে একটু একটু পড়ায়। তিতিলকে বলে, তার নরম গালে নিজের মুখ ঠেকিয়ে বলে, 'শুধু দুষ্টুমি করবে তুমি। পড়তেও তো হবে।'

এই সব সুযোগেব অপব্যবহার তিতিল কখনও করে না। ঠিক সেই সময়, সেই সুযোগে নিজেকে সুলতার কাছ থেকে টেনে এনে বলে, 'তাহলে তুমি আমায় জ্যান্ত খবগোশ কিনে দাও। আর একটা সবুজ পাখি।'

কাছ থেকে সরে যাওয়ায় সুলতারও রাগ কম হয় না। বলে: 'যাও, কিচ্ছু দেব না। আমার কাছে থাকতে চাও না, কথা শোন না।'

পরম নিস্পৃহ তিতিল। 'বেশ, আমি তাহলে যাচ্ছি।' চোখ কাত করে পিছনে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে এগোবার চেষ্টা করে। সুলতা তখন তাকে ধরে এনে বলে, 'বেশ সব কিনে দেব। লক্ষ্মী হও তো।'

একদিন হঠাৎ দেখা গেল, তিতিলের খরগোশ আর পাখি এসেছে।

এমনি কথায়, খেলায় সুলতার দুপুরগুলো ভরে ছিল কিছুকাল। বেশ কয়েকটি দীর্ঘ মাস, প্রায় বছর দুয়েক। তারপর একদিন হঠাৎ অবাক হয়ে সুলতা দেখল, তিতিলের বাবা রমেশবাবু ডাক্তার নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন। রমেশবাবু মুখোমুখি হতেই তিনি কেমন যেন লজ্জিত মুখে পাশ কাটিয়ে গেলেন। তারও কিছুকাল পর হঠাৎ একদিন দুপুরে তিতিল দৌড়ে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি। মামার বাড়ি, মার সঙ্গে।'

কথা শুনে কিম্বা হঠাৎ এমন করে তিতিল এসে বুকে পড়ায় সুলতার বুকটা কেমন টন টন করে ওঠে। কোনো কথার উত্তর না দিয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। তিতিল একা একাই খানিকটা খেলা করে নিরুৎসাহ হয়ে এক সময় চলে গেল।

বিকেলে নবনী ফেরার পর তিতিলের খোঁজ নেওয়ায় সুলতার বুকের ব্যথাটা যেন আবার মোচড় দিয়ে উঠল। বলল, 'তিতিল যা' দুষ্টু হয়েছে, আর ব'লো না। দুপুরে এমন করে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়েচে যে, ব্যথায় এখনও বুক টন টন করছে।' আবার বলল, 'ওরা নাকি সবে মার সঙ্গে মামার বাড়ি চলে যাবে।'

এ-কথায় ধাক্কা খায় নবনী। 'মামাবাড়ি কেন?'

সুলতার চোখের দিকে তাকিয়ে অবশ্য নবনী একটু সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারে। সুলতার চোখের কোণ লজ্জায় যেন ঈষৎ কুঞ্চিত।

সত্যি তাই। দিন দুই পর এক রবিবার সকালে তিতিলের মা

সুলতার ঘরের সমনে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে সুলতাকে বলল, 'আমার জান ভাই আর রেহাই নেই। আবার বাপের বাড়ি। ফিরতে ফিরতে আবার ছ' মাস। এর মধ্যে ঘর দোর বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলুম। আবার এসে কি হাল দেখব কে জানে।'

সুলতার হাতখানা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ধরে আগের কথার সঙ্গে যোগ করল, 'তোমার কথা কিন্তু সব সময় মনে হবে। ভাবছি তিতিলের আবার অসুখ না করে। যা করতে তুমি ওকে—তবু তো নিজের না। তোমার কথা ভেবে হয়ত অসুখে পড়বে। আর তা' ছাড়া তোমার ? তোমার সমস্ত দিন কাটবে কেমন করে। কর্তা তো থাকবেন অফিসে। নিজের কোলে একটি এলে বুঝতেও পারতে না, সময় কোথা দিয়ে পাব হয়ে গেল।'

এ কথাগুলি না বললেও চলত। তিতিল যাওয়ার পর থেকে সে নিজেই বুঝতে পারল। এখন হাতে তাব কত সময়। বার বার বিছানার চাদর টেনে সমান কবতে হয় না। ছবি দেখিয়ে গল্প বলতে হয় না। এ কথাগুলি অনুভব করার সঙ্গে তার বুক বেদনায় ঈষৎ স্ফীত হয়। কেমন যেন কাঁপে। তবু ছাদে উঠে, বার বার বসে শুয়ে সময় কাটাবাব চেষ্টা। এখন তার দুপুর আর শ্রান্ত নয়। নির্জন বিষণ্ণতায় ক্লান্ত .

একদিন সকালে কি এক কদর্য অনুভূতিতে সুলতার সমস্ত শরীব মোচড় দিয়ে ওঠে। কেমন ঘৃণায় ওর গলা বারে বারে আটকে যায়। এমন এর আগে কখনও হয়নি তার। রাত্রে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল, নবনীর মুখের ওপরের সারির একটা দাঁত থেকে অনর্গল রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল তার, কাল সারারাত তার গায়ের ওপর বুঝি নবনীর হাত ছিল না। একটা ঠাণ্ডা সরীসৃপ এলোমেলো গতিতে হেঁটে গেছে।

সুলতাকে এমন দেখে নবনী বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশের

দরজায় তিতিলের বাবার সামনে এসে দাঁড়াল সে। অদ্ভুত সাদা মুখটা নবনীর কেমন ঘেমে ঘেমে যাচ্ছে। কোঁচার খুঁট দিয়েও তা মানানো যাচ্ছিল না। সমস্ত চেহারায় তার যেন কেমন নিঃস্বতা।

রমেশবাবু এসে দেখলেন। সুলতাও দেখল তাঁকে। সুঠাম বাহু। লোমশ বুক। ভারি, ভরাট মুখ। চোখ নামাল সুলতা। হেসে অভিজ্ঞ লোকের মত রমেশবাবু বল্লেন, 'ভাববার কিছু নেই। দেখুন না আরো দু' একদিন। বমির ভাবটা থাকে কি-না।'

নবনী সত্যি ভরসা পায়।

কিন্তু এ ভরসা বেশী দিন থাকে না। দিনকয়েক পরই সুলতা এবং নবনী দু'জনেই টের পায়—ব্যাপারটা কিছুই না। শুধু সুলতার অনুভূতি-তে আরো শৈত্য, আরো শৈথিল্য নেমে আসে। নবনীর ভাসা ভাসা চোখ, অদ্ভুত ফর্সা, প্রায় হাড়ের মত সাদা শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সুলতা কুঁকড়ে যায়।

একদিন দুপুরে, সেদিন নবনীর অফিস ছুটি, ওরা দু'জনে বসে গল্প করছিল। কিন্তু গল্প তেমন যেন জমাট বাঁধছে না। ঘুরে ফিরে সুলতা সেই তিতিলের কথায় সরে আসছিল। একবার একেবারে নির্লজ্জ হয়েই যেন বলল সুলতা ঃ

'জান আমাদেরও একটা বাচ্চা হলে বেশ হয়। আর এমন একা একা সমস্ত দুপুর আমার কাটতে চায় না। বড় অসহ্য লাগে।'

নবনী মাথা নীচু করল। তারপর কি ভেবে বলল, বেশ হেসেই, 'এই তো বেশ আছি। বাচ্চা মানেই তো আবার বাড়তি খরচ।'

সুলতার জীবনে বুঝি এত ঘৃণা সে কখনও আর কাউকে করেনি। ঠিক এই মুহূর্তে তার চোখে যেন ঘৃণা উপচে পড়ে। তবু কিছু বলে না, আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

নবনী দ্রুত পায়ে সুলতার পাশে এসে দাঁড়াল। চিবুক ধরে মুখ তুলে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেমন নিস্পৃহ ভঙ্গী শরীরের রেখায় রেখায় এনে সে সেখান থেকে চলে গেল।

সে-ঘৃণা আর কখনও সুলতার মন থেকে মুছে যায়নি।

রমেশবাবু তাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী এর কোন খবরই জানেন না। রেলের চাকুরে, নাইট ডিউটি সেবে দুপুরে ঘুমুচ্ছেন। তিন সপ্তাহ পর পর তাঁর নাইট পড়ে। সমস্ত ঘর কেমন অপরিচ্ছন্ন। ধুলো ময়লা। ভেজা লুঙ্গি এবং গামছা দরজার ওপর ঝোলানো। কেমন চাপা, কেমন এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া। কেমন স্যাঁত-স্যাঁতে ভেজা মাটির গন্ধ। তবু সুলতার বেশ ভাল লাগে। কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন নেশা লাগে। মৃদু পায়ে ঘরে ঢোকে সে। ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলার তালে প্রকাণ্ড চওড়া বুকটা ভদ্রলোকের ওঠানামা করছে। রমেশবাবুব মুখের দি:কে তাকিয়ে, তার সমস্ত শরীরের শক্ত মজবুত কাঠামোর দিকে তাকিয়ে সুলতা ভাবে, এই ভদ্রলোক তিতিলেব বাবা।

খুট করে কি শব্দ হওয়ায় হঠাৎ ঘুমের নেশাটা ভেঙ্গে যায় রমেশ-বাবুব। চোখ খুলে এমনভাবে সুলতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হন তিনি। কিন্তু এমনভাবে খুব বেশিক্ষণ আর তিনি অবাক থাকেননি। একবার গোঁফের নীচে তার ঠোঁটটা ঈষৎ প্রসারিত হল।

একটু পরে বিছানা ছেড়ে উঠে রমেশবাবুই আর ক'টি দরজা বন্ধ করে দেন।

নবনীর মনের গুমোট ভাবটা যেন হঠাৎ কেটে যায়। সুলতা বলে, অনেকদিন পর আব্দারের সুরে বলে, 'আমাদেব জন্য একটা বড় লাইফ সাইজ আয়না কিনবে?'

ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুতর নয়। নবনী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়েছিল। আবার সুলতা তার কাছে ফিরে এল। তার সান্নিধ্যের উত্তাপ নেবার চেষ্টা করে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখে সুলতা। তার: নিয়মিত দুপুরের আর আর হাল্কা কাজের সঙ্গে এই এক নতুন কাজ।

শরীরের সমস্ত আবরণ একটি একটি করে খুলে সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। সামনে থেকে, পাশ থেকে, নানা কোন থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে নিজের শরীরটাকে দেখে। দেখে, কোথাও কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। নতুন কোনো রেখা পড়ে কি-না শরীরে।

হঠাৎ একদিন সুলতার কেমন গা বমি বমি করে। পেটে কেমন মোচড়ানো ব্যথা। বাঁদিকে অনেকটা জুড়ে সেই ব্যথা ক্রমশই কেমন ছড়িয়ে যাচ্ছে। পিঠ বাঁকা করে, কোনও মতে রেলিঙে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। এই ব্যথায় কি ভেবে তার মুখে রক্তের আভা লাগল। এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে যেন এই ব্যথার সমস্তটুকু অনুভব করছিল। অনেকক্ষণ এমন করেই শুয়ে ছিল সে। পাশ যখন ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নবনী ফিরেছে। তার শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত মুখ দেখে বড় করুণা হয় সুলতার।

সুলতার পাশে বসে নবনী আস্তে আস্তে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এক সময় অবনীর শ্রান্ত মুখটা নিজের স্ফীত বুকের ওপর চেপে ধরল। তারপর ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে বালিশে মুখ লুকোল।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার নবনীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। সুলতা পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। নবনীকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে খুব চাপা গলায় বলল ডাক্তার, 'না, না, সে সব কিছু নয়। মনে হচ্ছে পেটে ব্যথাটা অন্য কোনো কারণে। একটা ওষুধ লিখে দিলাম, খাইয়ে দেখুন কি হয় ?'

চারিদিক ভাল করে সতর্ক চোখে তাকিয়ে নবনী ডাক্তারের হাত দুটো মুঠোয় ধরে বলল : 'ভাবনার তো কিছু নেই ?'

ডাক্তার চলে যাবার পর কুটিল এক সন্দেহের ছায়া পড়ল সুলতার চোখে। হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'তুমি তো বাচ্চা চাও না। তাই অমন ফিস্ ফিস্ করে ডাক্তারের সঙ্গে কথা তোমার। তোমার হাতের এক ফোঁটা ওষুধও আমি খাব না। কখনও খাব না।'

নবনী চুপ করেই থাকে। কোনো উত্তর না করে প্রেসক্রপশন হাতে বাইরে বেরিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে, একা একা হঠাৎ সুলতা নিজেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির। সব শুনে ডাক্তার একই কথা সুলতাকে বলল ; যে-কথা নবনীকে বলেছে আগের দিন। শুধু মাঝে অনেকটা কথা গোপন রাখল।

'শরীরের ওপর যত্ন নিন। খুব ঘুরে ফিরে বেড়ান। এখুনি অবশ্য তেমন কোনো লক্ষণ নেই, তবে শরীর ভাল হলে হবে। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন।'

একেবারে ভেঙ্গে পড়ল সুলতা। বমেশবাবুব সমস্ত শক্ত শরীরের বাঁধুনীটা একবার নড়ে চড়ে তার চোখেব ওপর ভেসে উঠল। তাবপরই ভেঙ্গে পড়ল যেন। চাপা কান্নায় জড়িয়ে প্রায় ফিস্ ফিস্ কবে বলল ঃ

'তবে লুকিয়ে আমায় একটা ওষুধ দিন, যাতে তাড়াতাড়ি হয়। ওকেও বলবেন না। ও হয়ত অন্য কিছু মিশিয়ে দেবে।'

স্তব্ধ সাদা চোখে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে সুলতা প্রেসক্রপশন নিয়ে চলে এল।

সুলতার তাড়ায় তাব দু'দিন পবেই ওবা সে-বাড়ি ছেড়ে এ-বাড়িতে এসেছিল।

তারপর থেকে আবার সুলতার দুপুরগুলি এমনি নির্জন কাটে। বারে বারে এক কাজ করেও তার সময় পার হতে চায় না। বাঁধা ধরা তাই কোনো সময় সে কাজের জন্য ঠিক করেনি এখনও। শুধু খুব অল্প সময়ের একটি কাজ ছাড়া।

নির্জন মেঘলা দুপুবগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে তার সব কথা মনে হয় আজ। হাতের ওপর জড়ো করা কাপড় আর রুমাল।

এমনি অবাক হয়ে কতক্ষণ কাটত বলা যায় না। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় নীচে নেমে এল।

ঘরের চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ করে আলমারিব চাবি খুলল। একটু পরে একটি ওষুধের শিশি বার করল। আবারো চারিদিকে তাকাল সতর্ক দৃষ্টি মেলে। তারপর গ্লাসের ওষুধ গলায় ঢেলে দিল। একটু সময় বিস্বাদ লাগে। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে তার এখন।

স্নুলতা লক্ষ্য করেনি, রাস্তার দিকে জানালার একটা দরজা তখনও খোলা। নবনী এসে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে।

একবার ভাবল নবনী, ফিরে যায়। তারপর সদর দরজার দিকেই জোরে পা এগিয়ে দিল। হয়ত আজ সে বলবে স্নুলতাকে ডাক্তারের সব কথা। বাচ্চা তার কখনও হবে না। যে ওষুধই সে খাক। কেউ ওকে মা করতে পারবে না।

নিবারণ আবার ভাবল, বয়স হলে হবে কি, গলার জোরে কম যায়না। সেই কখন, কোন সকাল থেকে গলাবাজী সুরু করেছে, এখনও থামল না! মনে মনে বেশ বিস্ময় বোধ করে নিবারণ। দিনের প্রহরগুলি এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে তার গলাও চড়েছে। আর সেই জোরালো গলার বর্ষণে কমলার মা কমলাকে একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছে। মাঝে দু' একবার কমলা একটু আধটু জবাব দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বন্যার জলে ভেসে যাবার মতই তার অবস্থা। এখন বেশ বিজয়ী গর্বে কমলার মা শতমুখ।

এর আগেও নিবারণ চিৎকার হৈ চৈ অনেকবার শুনেছে। তা' থেকেই একটা কিছু কারণ অনুমান করবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু তা' যেন অথৈ জল। কূল কিনারা পাওয়া যায়না। মিথ্যাই জল ঘোলা করেছিল সে। তবে মাত্র কয়েকদিন আগেই তা' সে জানতে পারে। তাও সে জানত না, যদি কমলার মা এসে তাকেও দু' কথা শুনিয়ে না যেত। কমলার মা এসে সেদিন স্পষ্টই বলে গেল,

'বাছা দোকান করবে বলে ঘর ভাড়া নিয়েছ, তা বেশ। কিন্তু ভেতর বাইরে সব ক'টা দরজা জানালা অমন হাট করে খুলে রাখ কেন? তোমরা নয় বাউণ্ডুলে। তিন কূলে কেউ নেই। কিন্তু আমাদের তো লোকজন আছে· দু'একঘর অন্য ভাড়াটেও আছে বাড়িতে। বলতে নেই, তাদের বউ মেয়ে আছে। তাদেরই বা কেন। আমারও তো ঘরে মেয়ে। সেও তো কচি খুকি নয়।'

প্রথম প্রথম কথাগুলি বেশ মোলায়েম করেই বলছিল কমলার মা। কিন্তু নিবারণের পিছন দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মেজাজটা

রুক্ষ হয়ে উঠল। গলার সুরেও তখন তার উত্তাপ। চোখদুটো ঘুরিয়ে যাবার আগে বলে গেল,

'ওসব ফষ্টি নষ্টি এখানে চলবে না। হ্যাঁ, একথাটি স্পষ্ট করে বলে দিলাম আজ। এটা গেরস্ত পাড়া। তুমি এখানে ভাড়া না থাকলে বাড়িওয়ালা বুঝবে। কিন্তু আমাদের কোনো অসুবিধা করা চলবে না, বুঝলে ?'

নিবারণের মন, সমস্ত মন কেমন কদর্য গ্লানিতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কলকাতার লোকগুলো সম্পর্কে এক বিরূপ চিত্র আঁকা হয়ে গেল তার মনে। ঘুরে ফিরে সে একই ধারণায় আসে। কলকাতার লোকগুলোই কেমন কেমন। একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকায় ঠিক, মনের দিকে নয়। তার চেয়ে তার গ্রাম অনেক ভাল। তার গ্রামের লোকগুলো একটু আধটু গালমন্দ করে। হয়ত মারামারিও। কিন্তু এমন নয়। এমন অদ্ভুত ! গ্রামের কথায় নিবারণের মনটা হু হু করে ওঠে। অথচ সে জানে, সেখানে, তার গ্রামে আর সে ফিরে যেতে পারবে না। কোথায়ই বা যাবে সে। কোথায় গিয়ে উঠবে। তার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য ঘরও নেই তার। বারে বারে নিবারণ ম্লান হয়ে যায়।

তার সেই গ্রাম। রাণীবাঁধ। ছোটটিলা। আর শাল শিরিষের বেড়া। ফাল্গুন চৈত্র মাসের বিকেলে হাওয়ায় রঙ লাগায় শিরিষ ফুলের গন্ধ। সেখানে, সেই রাণীবাঁধের রাস্তায় মুনিষ খাটত নিবারণ। তবুও তা' ভাল লাগত তার। কিন্তু সেখানেও এই কলকাতার লোক।

টেস্ট রিলিফের কাজ। অনেক দূরের রাস্তা তৈরী হবে। লোক খাটবে অনেক। একটু আধটু পড়তে লিখতে জানত নিবারণ। তাই মেটের কাজ পেয়েছিল একটা। কাজ আর কি ? পুরুষ আর মেয়ে, কুলি এবং কামিনদের মাঝে মাঝে ধমক দেওয়া। আর পে মাস্টারের

সঙ্গে বখরা করা উপরির। তখন তাকে অনেকে বলেছিল। নিজের লোককে ফাঁকি দিতে নেই। কার কথা কে শোনে। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথেই তখন তার মোহর দেখার স্বপ্ন।

শুধু সে-খানেই নিবারণ থামেনি। এখন তার মনে হয়। বালির ওপর ঢেউয়ের রেখার মত। আঁকা বাঁকা, ভাঙ্গা অনেক কথা।

সন্ধ্যার পর, সমস্ত চৈত্র ফাল্গুন ঘিরে, বাঁশী আর মাদলের সুরে সুরে নেশার ঘোর লাগত তার। সঙ্গে তখন ওভারসীয়ার, পে-মাস্টার আব অন্য অন্য মেট। কোনো কোনো দিন দল বেঁধে নাচ দেখতে যেত। কিন্তু কে নাচবে তাদের সকলের সামনে? নিবারণ গাঁয়ের লোক। সে থাকলে আপত্তি নেই। সে-ও নাচতে পারে। কিন্তু আর সব মানুষ! তাদের চোখের ভাষা যেন রাণীবাঁধের কামিন-গুলো বোঝে। তাই তাদের সামনে দাঁড়ায় না। মাদলের বোল থেমে যায়। বাঁশীর সুর। হেলে দুলে, কোমর কাত করে ঘরে চলে যায়। ঝাঁপি আটকায় সকলের চোখের ওপর। নিবারণ ফিরে এসেছে অনেক বার। কিন্তু, আবার এক কদর্য অনুভূতিতে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে সে। সেখানেও সেই শহর কলকাতার লোক। নিবারণের মনে উঁকি দেয় সেদিনের ঘটনা।

তেমন ভদ্রলোক নয় নিবারণ কোনকালে। পাড়া বেপাড়ার বাগদী বাউড়ীদের সঙ্গে মিশে নেশা ভাঙ অনেককাল সুরু করেছে। এমন কি স্কুলের নীচু ক্লাসে যখন পড়ে, তখন থেকেই চটা তার মুখে। তাই বলে বেলেল্লাপনা! ভাবতেও পারে না সে। কিন্তু তাই সে করল একদিন। বেহেড হল সে।

নেশায় তার ঘোর লেগেছিল বুঝি একটু বেশি-ই সেদিন। রঙ লেগেছিল চোখে। আর, আর ওভারসীয়ার বাবুও সেদিন নাছেড়-বান্দা। নাচ দেখাতে তাকে হবেই। হাসিতে আটখানা নিবারন। বলল:

'কিরে বাবু, লাচ - লাচ দেখবি নাকি?'

আবার গেল দঙ্গল গ্রামের ভেতর। মাদল আর বাঁশীর সুর আসছিল যেখান থেকে। সেদিনও তেমনি এক এক করে নাচ থামাল কামিন সাঁওতাল মেয়েরা। পুরুষগুলো সরে দাঁড়াল আর এক কোণে। কিন্তু নিবারণের সেদিন আর হুঁস নেই। ভয়ে ছোট হয়ে, সবচেয়ে শেষে এক পা দু'পা করে এগুচ্ছিল যে মেয়েটি, তার হাত ধরে টানল। তারপরেই, অনেক হাতের আক্রমণে সে বেহুঁস হয়ে পড়ল। জ্ঞান হল, পরের দিন।

রাস্তায় বার হতেই সকলের মুখ টিপে হাসি। মরদ নাকি নিবারণ যে এমন বেলেল্লাপনা করতে গেল? অতই যদি সখ বিয়ে করে না কেন? বলে না কেন প্রাণের কথা আর কাউকে? আর তাতে যদি লজ্জা, সাহস করে বার করেও তো নিয়ে আসতে পারত মেয়েটাকে।

ঠোঁটের বাঁকা হাসি। তেরচা চোখের কাত করে করে তাকান। হঠাৎ যেন নিবারণের মনে হল, এ গ্রাম তার একেবারেই অপরিচিত, একেবারে অজানা। কি এক সঙ্কোচে তার মাথা নুয়ে এল। ঘরে আর ফিরল না সে। ঠিকাদারের তাঁবুর সামনে মুখ গুঁজে বসে রইল। এমন কি কাজেও গেলনা। মনে মনে মা কালীর দিব্যি করল, নেশা ভাঙ আর সে কখনই করবে না। কখনই না।

ভাবনার সূতো টানতে টানতে উঠে দাঁড়াল নিবারণ। এগিয়ে গেল কিছুটা। জানালার কাছে। জানালাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু কপাটে হাত দিতেই কার কথা যেন শুনতে পেল সে। বেশ নতুন, নরম গলার স্বর। আরো আশ্চর্য হল শুনে যে, তারই পক্ষ নিয়ে কথা বলছে নিবারণের অজানা স্বরে কথা বলা অচেনা একটি মেয়ে।

'তোমার ধমকের কেউ পরোয়া করে নাকি, যে ধমকাতে গেলে? ভাড়া দিয়ে ঘরে আছে, তোমার সুবিধে অসুবিধের ধার ধারতে তার বয়ে গেছে।'

'কি, তুই আবার আমায় শাসন করতে এলি কমলা?'

বাকীটুকু আর শুনল না নিবারণ। জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। পিঠ দিয়ে দাঁড়াল জানালার ওপর। তখন কমলার মার কথাগুলো অস্পষ্ট। তবু মনে হল, তার টিনের দেওয়ালে লেগে কমলার মার কথাগুলি ঝনঝন করে বেজে চলেছে। কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে নিবারণের চোখের সামনে বালু সমুদ্রের ঢেউ দেখা দিয়েছে। ভাবল, এই কি তবে কমলা! বুড়ীকে চিনত নিবারণ কমলার মা বলেই। আর সেদিন মাত্র সে চিনল কমলাকে। কিন্তু মেয়েকে অমন দেখতে হলে হবে কি? বেয়াড়া তো কম নয়। মার মুখে মুখে অমন করে জবাব দেয়! তবে এব চেয়েও যে-টুকু তার ভাল লাগল, সেটকুই, তার মনে মৌমাছির গুন গুন করল। ভাবল কথাটা মিথ্যে কিছু বলেনি কমলা। সত্যি তো। সে তো আর বিনা ভাড়ায় থাকেনা। আরো কিছু হয়ত শোনা যেত। কিন্তু বুড়ীব ওই মাবমুখো মূর্তি দেখে কি দাঁড়িয়ে থাকা সহজ। হয়ত এখনই কিছু অঘটন ঘটবে।

সকাল থেকেই বেশ কৌতুক বোধ করছিল নিবারন। কারণ এই গালিগালাজেব পরোক্ষ উপলক্ষও এখন আর সে নয়।

'এই গরমে', নিবারণ কিছুদিন আগে বুঝিয়ে বলেছিল কমলার মাকে, 'জানালা বন্ধ করে কি মানুষ থাকতে পারে? সমস্ত ঘরে জানালা মাত্র একটা। তাও যদি বন্ধ থাকে, হাওয়া চলাচল করবে কোথা দিয়ে?'

নিবারণের কথা শুনে কমলার মা তাকে ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছে— জানালা খুলে রাখবার। আর সেই সঙ্গেই বলেছিল,

'কারু বাপু আমি অসুবিধে করতে চাইনা। বুঝলে বাপু। আর তোমার কথাও ঠিক বটে। টিনের চাল, টিনের দেয়াল, একটু আধটু হাওয়া চলাচল না করলে চলবে কেমন কবে? আর এখানে সবার বাড়া বয়েস তো আমার, তোমাদের সুবিধা অসুবিধা না দেখাও তো অন্যায্য।'

গলায় তার তারপর কেমন এক নির্লিপ্ত আলস্য।

'বেশ তো, তোমার জানালা তুমি খুলে রেখ। আমারটা বরঞ্চ বন্ধ করে দেব আমি।'

কথাগুলি বলে কমলার মা চলে যায়। আর নিবারণের মনে হয়, বয়সের জন্য মেজাজটা এমন খিটখিটে। আসলে বুড়ী লোক তেমন মন্দ নয়। তারপর থেকে এ'কটা দিন সে জানালাটা নিয়মিত খুলে রেখেছে।

আজ কিন্তু গর্জন বর্ষণ অনেকক্ষণ ধরে চলেছে। অনেকখানি সময় ধরে কমলার মা সকালের জের টেনে চলেছে। রণে ভঙ্গ দেবার কোনো চিহ্নই নেই। বোধ হয় ঘণ্টা দুই হয়ে গেল, এখনও থামল না। একটু সাহসে ভর করে জানালার কাছে, খুব ঘনিষ্ঠ ব্যবধানে এসে দাঁড়াল নিবারণ। একবার দেখল তেরচা চোখে বাড়ির ভেতরটা। এর আগে সে কথা শুনেছে কমলার, এবার দেখল, সে প্রথম দেখল কমলাকে। সিঁড়ির ওপর বসে। কনুই ভেঙ্গে হাতের তালুর সঙ্গে মুখটা তার লেপ্টে আছে। একটু যেন বাঁদিকে হেলান কাঁধটা। আর ডান হাতে, একটা ভাঙ্গা কাঠি দিয়ে কি যেন আঁকি বুঁকি করছে দালানের ওপর। সেই রেখাঙ্কনেই তার মন তখন নিবিষ্ট। মার কথা একটুও বুঝি তাকে ছুঁয়ে যেতে পারছে না। কেমন ভাল লাগল নিবারণের কমলাকে দেখে। হঠাৎ নত চোখ তুলে ধরল কমলা, সামনে। তার মার দিকে তাকাতে। কমলার মা তখনও নিবারণের জানালার দিকে পিঠে দিয়ে দাঁড়িয়ে। একটু বুঝি ভয় পেল নিবারণ। তাকে আবার কিছু বলবে না তো? যে-মায়ের মেয়ে। বিচিত্র কিছুই নেই। কিন্তু একি বলল কমলা? বেশ স্পষ্ট শুনতে পায় নিবারণ কমলা বলছে,

'বেশ এই যে এবার জানালা বন্ধ করলাম, আর জীবন থাকতে ও খুলব না।'

তারপর মুখের ওপর আঙ্গুল তুলে বলল,

'পূব দিকে তাকিয়ে, সূর্য সাক্ষী করে বলছি ; সত্যি, সত্যি, সত্যি,'।

আর তার অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে এক পায়ের পাতা মাটির ওপর তিন বার আছড়ে পড়ল।

এততেও ,তবু কমলার মার তুষ্টি নেই। গলার স্বর আরো এক পর্দা উঁচুতে তুলে ধরল ঃ

'কিন্তু তাকি তুই করবি ? তা হলে তো বাঁচি। মেয়ের লজ্জাও নেই গলা বাড়িয়ে ঝগড়া করতে। জানালা না খুলে রাখলে তো তোর ভাত হজম হবে না।'

এবার স্পষ্ট অসঙ্কোচ চোখ তুলে কমলা নিবারণের দিকে তাকাল। একটু একটু কেঁপে উঠল তার ঠোটদুটো। সেই চোখ দেখে নিবারণের মনে হল, এই মুহূর্তে কমলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয় নিবারণের। গলাটা তার কেমন আড়ষ্ট। তার মনে হল, কমলার মা কথাগুলি তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে। কমলা কি সত্যি তাকে দেখার জন্য জানালাটা খুলে রাখে! চমক ভাঙল তার। সহসা এক শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখল, সত্যিই কমলাদের জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

এবার কেমন ক্ষোভ হয় নিবারণের কমলার মার ওপর। কিছুক্ষণ আগেও তার তাকে তেমন খারাপ মনে হয়নি। মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনার রেশ তখনও তাকে ছুঁয়ে। এখন দেখছে, বুড়ী মনে মনে বিষের হাড়ি। আহা-হা। মেয়ে তোমার জানালা খুলে রাখবে না তো করবে কি ? আটকে তো রেখেছ এক কূয়োর মধ্যে। নিবারণ ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে সরে এসে বসল নিজের জায়গায়।

এভাবে কি তার দাঁড়িয়ে থাকলে চলে ? কত লোক আসবে এখন তার দোকানে। এরই মধ্যে হয়ত তাকে জায়গায় না পেয়ে, আড়চোখে দোকানের দিকে তাকিয়েই অনেকে চলে গেছে। শুধু

কি দোকান-ই সব। ডাকতেও হয় লোকজনকে দোকানীর। তা না হলে কার অমন দায় পড়েছে ডেকে জিনিষ কেনার। সামনের দিকে এসে বসল এবার নিবারণ। বসল সে ঠিকই, কিন্তু মনটাকে যেন সে কিছুতেই গুছিয়ে আনতে পারে না। তার সমস্ত মনে কেমন যেন ভার। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না। কেবলই ঘুরে ফিরে তার মনে প্রশ্ন আসে—কেন কমলা এমন করে জানালা বন্ধ করে দিল? আর সেই সঙ্গে তার কলকাতার ওপর রাগটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

লজ্জায় সেদিন মাথা তুলতে পারে নি। ছোট জাত বলে আর যারই মান বালাইয়ের পাট তোলা থাক, নিবারণের তার অভাব ছিল না। স্কুলে পড়েছে অনেক দিন। দু'চার ঘর কায়েত বামুন যারা গ্রামে ছিল, তাদের সঙ্গেও তার হৃদ্যতা। তাই মনে মনে ধিক্কার জমে উঠেছিল সেদিন নিবারনের। এমন বেহেড হল কি করে? যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। ঠিকাদারের তাঁবু লোক-শূন্য। তারই দরজায় বসে চৈত্রের শিমূল রাঙা দুপুরটা মাথায় করে কাটাল। বিকেলে সব ফিরে এসে নিবারণকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক। ওভারসিয়ার বাবু তখনও রসিক। আর সকলকে বলল:

'বাবুর আমার গোসা হয়েছে। তা' আজ একটু ভাল ব্যবস্থা হোক।'

কিন্তু নিবারণের গলায় তখন অন্য সুর।

'ইয়ারকি রাখেন বাবু।'

যতই মনিব হোক। হোক কাজের মালিক। তবু এদের সামলে নিয়েই চলতে হয়, ওভারসিয়ার আর ঠিকাদারবাবুদের। চাই কি তেমন ইচ্ছে হলে, জোট বেঁধে কামিন কুলির অভাবও ঘটিয়ে দিতে পারে। তাই নিবারণের এমন কথাও হজম করে বললেন:

'কেন রে মন খারাপ কেন। কলকাতায় যাবি? যদি যাস্ তো

যা, ওখানে তোর চাকরি যোগাড় করে দেব। চিঠি দিলেই চাকরি।'

এর আগে সে কখনও কলকাতা দেখেনি। এমন কি ভাবেওনি কলকাতার কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যে তার কি খেয়াল হল! ভাবল এখানে যখন তাকে আপন ভাবতে কেউ রইল না, তখন তার কলকাতায় যেতে আর বাধা কি? হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলল, কলকাতাতেই সে যাবে। বলল:

'আপনার কেনা হয়ে থাকব বাবু। চিঠি দিন একটা যাতে কাজ হয়। আর আমার পাওনা মিটিয়ে দিন। আমি কলকাতাতেই যাব।'

তারপর এই কলকাতা। চিঠি একটা ওভারসীয়রবাবু দিয়েছিলেন ঠিকই। এক চায়ের দোকানে। কাজও পেয়েছিল সে। কিন্তু একদিন মার খেয়ে রাতারাতি ভেগে এল সে দোকান থেকে। বলতে কি, ঘুম তার একটু বেশী। আর চালের দেশের মানুষ সে। তুলনায় ভাতও খায় একটু বেশী। তেমন আর কে মানব আছে, তবু তাকে টাকা দিয়ে রাখবে?

তারপর থেকে আর হাঙ্গামার শেষ নেই। প্রথম কয়েকটা দিন স্টেশন আর পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে কাটাল। দু'একজনের পরামর্শে একবার গামছা গেঞ্জী ফিরির চেষ্টা যে না করেছে, তা নয়। কিন্তু বিক্রেতা তো সে মাত্র একা নয়। সেখানেও তাই গোলমাল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিরি করবে সেখানেও বাধা। বিক্রেতা যে আরো অনেক। তাই প্রতিযোগিতায় কে আর নতুন লোক দেখতে চায়। তখন থেকেই নিবারণের চেনা হয়ে গেছে কলকাতার লোকগুলোকে। একেবারে তাকে সরে আসতে হল। লোকসানও কম হয়নি তার। কেনা দামেই শেষে মাল ছাড়তে হল। তা-ও ক্রেতা নেই। হেঁকে বলায় বাধা। মহাজনের ঘরেই পরে মাল পৌঁছে দিয়ে এল একদিন।

কিন্তু পার্কে বা স্টেশনে এমন করে কতদিন থাকা যায়? করবেই বা কি? তাই বাকি টাকায় অবশেষে চুড়ির ফিরি সুরু করল।

কাঁচের চুড়ি। নানা রঙের। আর নানা রকমের। অবসর সময়ে সে কতবার হাতে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে। সূর্যের আলোয় যেন রঙ আরো খোলতাই হয়। কতজনকে সে চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে। মনে মনে এখন সে তার হিসেব করতেও পারেনা। সেই সব সময়, যখন তার ক্রেতাদের চোখ হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে খুশীতে নিস্পলক হয়েছে। তখন অজান্তে তারও মুখে হাসি এসেছে। চুড়ি বিক্রী। সেখানেও প্রতিযোগিতা। কিন্তু নিবারণ তখন পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে বেড়ায়। এক এলাকায় অসুবিধা ঘটলে অন্য পাড়ায় যাবে। একদিনে দু'তিনটে পাড়াই যথেষ্ট।

কাজের প্রথমে তাব অসুবিধা একটু হয়েছিল। কেমন করে হাঁক দিতে হয়, জানত না সে। জানত না, কেমন করে বলবে, তাব ঝুলির মধ্যে আছে কাঁচের চুড়ি! অনেক রকমের। অনেক রঙের। কেমন করে যে কি করতে হবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি সে। তবু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাব লোকসান হয়নি। কিছু কিছু বিক্রী সব সময়েই হয়েছে। আর আর ফিরিওয়ালাদের মত হাঁক দিতেই লজ্জা তার বেশী। জানালায় দাড়ানো, কোনো কোনো বাড়ির মেয়েদের দেখে অতিরিক্ত, কিছুটা অহেতুক বুঝি, লজ্জায় মুখ নুয়ে যেত তার। হাক দেবে কি! আরো লজ্জা কবত, যখন ডেকে জিনিষের দর শুনে হাসত। সে হাসি তার কথা শুনে। তাব কথার টানে। শুধু কি হাসি। একে অপরকে ঠেস দিত। হাসি যেন তাদের চোখেও। কিন্তু লজ্জা সে ঢাকবে কোথায়? মাথা গোঁজারই যে তার জায়গা নেই।

তখনও সে পার্কে শোয়। ধোপা বাড়িতে থাকে তার জামা আর কাপড়। হঠাৎ দেখলে তাব গ্রামের লোক, তাকে চিনতে দেরী করবে। কারন, এমন ধোপ দুরস্ত হয়েছে সে ইদানীং। আর এটুকু বুঝি তার দরকারও। তার যারা খদ্দের, যারা তার লক্ষ্মী, তাদের সামনে তো আর যাওয়া চলে না ময়লা পোষাকে।

এইভাবেই কাটল কিছুকাল নিবারণের। হোটেলে খেয়ে, পার্কের বেঞ্চে শুয়ে, এবং সারা দুপুর চুড়ি ফিরি করে। কিন্তু মনে মনে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। এমন করে আর কতদিন কাটানো যায় ?

কিছুদিন আগে বাগবাজারে ফিরি করতে এসেছিল নিবারণ। এখানে সব উল্টো। বস্তি আর নীচু নীচু আটপৌরে বাড়ির ভাড়াটাদের সখ যেন একটু ভিন্ন ধাঁচের। কাঁচের চুড়িতে তাদের মন ওঠে না। তবে ছোট ছোট মেয়েরা মাঝে সাজে খোঁজ নেয় বৈকি ? বাগবাজারের এমন এক রাস্তায় ফিরি শেষ করে ফিরছিল নিবারণ। হঠাৎ তার নজরে পড়ে, প্রায় বড় রাস্তার ওপর ছোট একখানা ঘর। ঘরটিতে কোনমতে একজন না ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পাবে। তখনও তা' খালি পড়ে। ঘর দেখেই তার মনে হয়েছিল, বেশ ছোট একটা দোকান হতে পারে সেখানে। বেশ মনে ধরেছিল ঘরখানা তার। নিবারণের মনে উঁকি দেয়, ঘরখানা সে যদি পেত। তবে আর তাকে এমন করে বেড়াতে হত না। কিন্তু ঘর খালি থাকার সঙ্গে যে তা' পাবার কোনো সম্পর্ক নেই, কলকাতায় এ ক'দিনেই এই বোধ তার হয়েছে। তাই সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায়। সন্ধ্যের পর আবার তো তাকে পার্কের বেঞ্চে ফিরে যেতে হবে। কথাটা মনে হতেই নিবারনের মাথাটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে। এবার সে মরীয়া। ঘরটির কাছেই সে ফিরে এল। দেখল, কে একজন ঘরে তালা লাগাচ্ছে। নিবারণ তাকেই জিজ্ঞাসা করল, বাড়িওয়ালা কে ?

লোকটি একবার নিবারণের আপাদ মস্তক দেখে নিল। পরে ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,

'বাড়ি যারই হোক না, আপনার কি ?' এই প্রথম নিবারণকে কেউ আপনি ডাকল। কেমন এক পদমর্যদা বোধে তার গলা ভারী হয়ে আসে। কথার অন্যটুকু তখনও তার শুনতে বাকী।

'ওসব পান বিড়ির দোকান এখানে করা চলবে না। ছোট ছোট ছোঁড়ারা তো এমনিতেই পেকে টুস। তারপর বিড়ি সিগ্রেটের দোকান এনে বাড়ির ওপর বসালে আর বাকী থাকল কি?' তখনও তার মন তালার চাবি লাগাতে ব্যস্ত।

'কিন্তু',

অধীর আগ্রহে ভরে আছে নিবারণের মন। যেন এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে সে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। তার এই অদম্য আতিশয্য থেকে। সে বলল ঃ

'আমি তো চুড়ির দোকান করব, কাঁচের চুড়ির।' লোকটি এবার ফিরে তার মুখোমুখি দাঁড়াল।

'কি বল্লেন, চুড়ির?'

কি যেন একটু ভাবল লোকটি। তারপর বলল,

'বেশ, মাসে ভাড়া কুড়ি টাকা। পোষাবে?'

নিবারণ তাতেই রাজী। ভাড়া ত্রিশ টাকা বললেই বা আটকাত কে? এত সহজে যে এমন একটি দুরূহ কাজ শেষ করতে পারবে, তা' ভাবতেও পারেনি কখনও। সঙ্গেই তার টাকা ছিল। ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে নিল সে। সেদিন নিবারণ যেন অনেকটা নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস। হাতের ব্যাগটা, কাঁচের ঢাকনা দেওয়া ব্যাগটা কোনমতে ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়ল সে। সেদিন অনেক হাল্কা মনে হয়েছিল তার নিজেকে।

মাস দেড়েক হয় দোকান দিয়েছে নিবারণ। বিক্রি বাটা তেমন মন্দ নয়। গঙ্গায় স্নান করতে যাবার পথেই তার দোকান। তাই লোকের অভাব বড় একটা হয় না। তবে অনেক সময়েই খারাপ লাগে। এত ভীড়। হয়ত কিনবে না কিছু। তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা চাই নানা রঙের চুড়ি। কখনও বা হাতের ওপর, গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে। সেখানেও তারা থামে না। একশবার দাম জিজ্ঞেস করবে। তারপর দরদস্তুর। শেষে হয়ত রফা হওয়ার পর

ওর জিনিষ রেখে দিয়ে বলবে, অন্য সময় লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে তার রাগ ধরে যায়। কিন্তু প্রকাশ করে না তা। এরাই তো নিবারণের ভাগ্য। তার লক্ষ্মী। এদের ওপর কি রাগ করলে চলে!

মুখে হাসি টেনে সেসব ক্ষেত্রে নিবারণ বলে, 'বেশ তো পছন্দ করে রেখে যান। পরে সুবিধে মত নেবেন।'

অবশ্য সে বোঝে, পছন্দ হলেও তা' তাদের ঘরে যাবে না।

এই দোকান, কলকাতার এই জীবন। নিবারণের পুরনো দিনগুলির কথা কেমন যেন ধূসর হয়ে গেছে এরই মধ্যে। নিজেকে তার এখন বেশ কৃতবিদ্য মনে হয়। তবু, তবু অনেক সময় রাণীবাঁধের কথায় যেন তার দৃষ্টি কেমন শূন্য হয়ে যায়।

সেদিনও কমলা জানালা বন্ধ করে দেবার পর নিবারণের ভাবনার ঘুড়ি আবার রানীবাঁধের আকাশ আশ্রয় করেছিল।

তখন তার দোকানে ভীড় ছিল কম। মেঘলা আকাশের নীচে ঠাণ্ডা বাতাস। সেই সঙ্গে টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা। সেই নিস্তেজ অলস আবহাওয়ায় মনটা কেন যেন তার আপনিই স্থবির হয়ে আসে।

কমলা জানালা বন্ধ করে দেবার পর নিবারণ প্রথমটায় ভেবেছিল, দু' একদিন পার হলে বুড়ী নিজেই জানাল খুলে দেবে। ও-রকম করে ঘরবন্দী হয়ে থাকা কি সহজ কথা! কিন্তু দু' একদিনের বদলে যখন বেশ কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল, তখন নিবারণের মনে হল, সত্যি বুঝি ও-জানালা আর কখনও খুলবে না।

নিবারণের এবার যত রাগ গিয়ে পড়ে কমলার ওপর। কি এমন হয়েছিল যে, জানালাটা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। মা, মাসী, গুরুজনের তো সবটাতেই খুঁতখুঁতি। তাই বলে প্রতিজ্ঞা করার অর্থ কি? কমলা সম্পর্কে এক বিচিত্র অনুভূতি তার চেতনায় জড়িয়ে। এক অপূর্ব বিস্ময় তার চারিদিকে ছড়িয়ে। তার সব

কথা বোঝা হয়ে উঠেছে। কারো কাছে বলতে পারলে সে হাল্কা বোধ করত। কিন্তু তার ভয়, কথার বোঝা আলগা করতে গেলে তা তে আরো বেশী জট বেঁধে যাবে। হয়ত কিছু বুঝিয়ে বলতে পারবে না।

দিনকয় পর, সকালে এক অভাবনীয় ঘটনা গেল। দোকানে সেদিন ভীড় বেশ। গঙ্গা স্নানের বোধ হয় বিশেষ কোনো পর্ব ছিল। মধ্যে যখন ভীড়টা একবার ফিকে হয়ে এসেছে, নিবারণ দেখল কমলা তার মার সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছে। সে তাকাল কমলার দিকে। কেমন এক ফাঁকা এবং শূন্য দৃষ্টি তার চোখে। কমলাও একবার তাকাল এদিকে। ঘাড় ফিরিয়ে মাব কাঁধের পাশ দিয়ে। কিন্তু কেমন যেন সে চাওয়া। নিবারণ ভাল বুঝল না। মাথা নীচু। ঠোঁট দুটো বুঝি দাঁতের সঙ্গে আটকে। নিবারণ কিছুই বুঝতে পারে না। কমলাকে দেখে বেশ উৎসাহই বোধ করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তা নিভে গেল।

সমস্ত দিনটা তারপর বিশ্রীভাবে কাটল নিবারণের। দোকানে কেনা কাটায় আর সে মন দিতে পারল না। একটু পরে, দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। এর পর সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। রাত্রে, অনেক রাত্রে ফিরে এল দোকানে। ঘরে ঢুকে আলস্যে ভেঙ্গে পড়ল সে। কোনমতে বিছানাটা গুছিয়ে নিতে পারল মাত্র। হঠাৎ তার মনে হল, কমলাদের জানালাটা খোলা। কিন্তু ও-ঘর অন্ধকার। কিছুই বুঝতে পারল না।

পরেরদিন ঘুম থেকে উঠেই ধাক্কা খেল নিবারণ। দেখল, তার দিকে একবারও না তাকিয়ে কমলা খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিল। কাল দোকানে ছিল না নিবারণ, হয়ত তাই জানালা খোলা ছিল। কথাটা উঁকি দিতেই কেমন দমে যায় সে। কিন্তু একটু, একটুক্ষণ মাত্র। তার পরেই চাঙ্গা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। মনে মনে ভাবে, কি হবে, একটা অচেনা মেয়ের কথা মনে

করে। কাজেও তার ফাঁকি পড়েছে এতে। হঠাৎ কর্তব্য নিষ্ঠায় সে সকালের কাজগুলি সেরে এল। স্নান সারল, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ালো। বেশ পরিপাটি করে। তারপর এসে বসল নিজের জায়গায়। কিন্তু আজও আবার কমলার মার চিৎকার।

'বলি',

কমলার মা বলছে কমলাকে।

'তোর কি এতটুকু বুদ্ধি নেই যে বুঝিস্ না, আইবুড়ো মেয়ের খালি হাতে থাকতে নেই। এরই মধ্যে সবকটা চুড়ি ভেঙ্গেছিস! আর মেয়ের আমার খেয়াল নেই কোন!'

তারপর অনেক্ষণ ধরে কমলার মা নিজের অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে অভিযোগ বর্ষণ করে।

এক সময়ে বলল,

'দাঁড়া দেখাচ্ছি।'

ব্যস আর কথা নেই। ভয়ে নিবারণের বুক হিম। মনে মনে বেশ উত্তেজিত। ভাবল, আবার মার ধোর না লাগায়। যে তেজী বুড়ী!

কিন্তু একি? হঠাৎ নিবারণ সামনে তাকিয়ে দেখে কমলাকে নিয়ে হাজির হয়েছে কমলার মা। তারই দোকানের সামনে। কমলার নিরাভরণ একটি হাত তখনও কমলার মার হাতে।

কমলার মা, আগের মত সেই পরমাত্মীয়ের সুরে নিবারণকে বলল,

'দাও তো বাবা, ওর হাতে কয়েকগাছা চুড়ি পরিয়ে।'

তারপর যেন নিজের কাছেই বলল:

বাড়ির সামনে দোকান। আর দেখ মেয়ের আমার হাতখালি কতদিন ধরে।

এবার চোখে কেমন যেন সন্ত্রস্ত ব্যস্ততার ভাব। নিবারণও ভয়

পায়। কিন্তু চোখ তার তখন কমলার ওপর। একবারও আর নিবারণের দিকে সে তাকাল না। কমলার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল :

'দরজা খুলে রেখে এসেছিস তো?'

অভিমানে গলে গিয়ে উত্তর করল কমলা। 'বারে।'

এই উত্তরে কমলার মা বিন্দুমাত্রও আস্বস্ত বোধ করল না। তাই মুখ ভেংচে সে-ও একবার বলল :

'বারে, তা না হলে তোর বুদ্ধি এতক্ষণে বাড়ির যত ছেলে পিলে নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলেছে।'

এবার মুখ ফেরায় কমলার মা নিবারণের দিকে। যাওয়ার পথে বলে,

'দাও বাবা চুড়ি পরিয়ে দাও। আমি আসছি ঘবের দোর দিয়ে। পাশের ঘরেব বাচ্চাতুটো একবার ফাঁক পেলেই হল, অমনি ঘরে গিয়ে ঢুকবে।'

একটু এগিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে আবাবো বলল,

'বেশ ভাল চুড়ি দিও কিন্তু।'

কিন্তু নিবারণ কি করে জানবে, কোন চুড়ি সবচেয়ে ভাল লাগবে কমলার। তাই চোখে প্রশ্ন নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে থাকল কমলার মুখের দিকে। উত্তর না পেয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল,

'কোন চুড়ি তোমার পছন্দ। কোনটা তুমি নেবে?'

কিছুই বলতে পারেনা কমলা। যেমনটি তার মা তার হাত তু'খানা নিবাবণের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই রেখেছে তার হাত তু'খানা। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। কোনোমতেই সে আর মুখ তুলতে পারছে না। কেবলই নুয়ে পড়ছে।

একজোড়া চুড়ি নিয়ে, তার দোকানে যেটি সবচেয়ে ভাল, নিবারণ এবার চেপে ধরল কমলার একখানা হাত। কি নরম!

নিবারণ ভাবে। কত জোরেই বা সে চাপ দেবে। যদি' ব্যথা লাগে কমলার। এ-তো শাঁখা পরানো নয় যে, ইচ্ছেমত হাতের আঙ্গুল গুলো চেপে ধরবে মুঠোর মধ্যে। সে যে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দিচ্ছে।

হাতের মুঠোয় কমলার একখানা হাত তুলে নিল নিবারণ। নরম অঙ্গুলগুলো আস্তে চেপে ধরে চুড়ি পরাতে লাগল। জোরে চাপ দিতে পারে না। কাঁচের চুড়ি যদি ভেঙ্গে যায়।

কমলার আকর্ণ লাল। সামনে এগিয়ে দেওয়া দু'খানা হাত তার। একখানার ওপর আর একখানা। যেন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নিবারণের মুঠোর মধ্যে এক হাত। এক হাত তখনও মুক্ত। কিন্তু কমলা ভাবে, আর একখানা হাত নিবারণ এখনও কেন গ্রহণ করছে না?

খেলোয়াড়

সকালের প্রথম সূর্যের ঝর ঝরে রোদ ঘরে। আশে পাশের বেড়ার বাধা এড়িয়ে খড়ের চালে একটু বুঝি পথ পেয়েছে। দেখে হঠাৎ মনে হয়, পাকা ধান-রঙ আলো একটি সোজা সঙ্কীর্ণ রেখায় মেঝেয় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আঁধার আঁধার থাকলে লজ্জা কম। কিন্তু আলোয় আর তাকানো যায়না নিজের দিকে। শৈথিল্যে এলানো কাপড়ে লাবু তখন তার সুঠাম দেহ ঢেকে দেয়। শরীরের আর আর প্রান্ত থেকে অনেকটা কাপড় জাড়ো করে এনে। বুক পেরিয়ে পায়েব দিকে আর নজর চলেনা। হাঁটু অবধি আলগাই, আতুড় থাকে।

উঠোনে তত আর কুয়াসা নেই। দূরে বাড়ির সীমানায় কলা ঝাড়েব পাতায় পাতায় তখনো কিছু জমা। আর, আরো দূরে বালিসার মরা নদীব বুকে। একটা দু'টো বাসনের আওয়াজ। টুং টাং। ঝাঁট পড়েছে উঠোনে। নারকেল পাতার শলা ঝাটার শব্দ। সপ, সপ। ভোরেব শেষ আমেজটুকু ভাঙতে গা মোড়া দেয় লাবু। পায়েব নীচে সরিয়ে দিয়েছে কাঁথাটা। ঘুম ভাঙ্গতে বড় দেরী হয় তার। এত বেলায় কাজে হাত পড়ে, শেষ যেন আর হতে চায়না। তাছাড়া অন্য অন্য ঘবেব মানুষগুলোই বা ভাবে কি?

বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়েও তবু বাধা। এতক্ষণ কনুই ভেঙ্গে চোখের ওপর হাত রেখে শুয়েছিল বানেশ্বর। বোঝার উপায় ছিলনা, সে ঘুমে না, জাগা। কিন্তু লাবু উঠে দাঁড়াতেই কাপড়ের কোন ধরে টানল। কাপড় সামলাতে আবার শুয়ে পড়ল সে। এবার প্রায় বানেশ্বরের বুকের ওপর। অবাক মানে লাবু। তবু এই ভোরে বানেশ্বরকে সে তার বুকের উত্তাপ দেয়।

আদুড় গায়ের সবটা যথাসম্ভব কাপড়ে আড়াল করে বাইরে আসে লাবু। চারিদিকে একবার তাকায়। কেমন বোবা দৃষ্টি যেন। কেমন শ্লথ আর মন্থর। খোপায় আটকানো এলোমেলো কাপড় মাথায় টেনে দিল। বাইরে এসে হঠাৎ আলো আর হঠাৎ বাতাসে ওর কেমন বোবা ধরে।

একটু পরেই আবার নিজের কাছে ফিরে এল লাবু। তারপর একটু শুধু সময় দিল যেতে। কাজের ধাঁধায় আটক পড়ার আগে।

পায়ে পায়ে বানেশ্বরও উঠে এল। লাবু একটুকুও টের পায়নি। আঁটকরে কাপড় বেঁধে সে রান্নাঘরে তখন।

কুলুঙ্গী থেকে তাসের বাণ্ডিলটা হাতে তুলে নিল বানেশ্বর। শূন্যে ধরে দ্বিধাবিভক্ত তাসগুলোকে শাফল করতে করতে এরই মধ্যে একবার এদিক সেদিক চোখ বুলিয়ে নিল বানেশ্বর। কারও বুঝি পিছু ধরতে তার এই অন্বেষণ। কন্তু লাবুকে সে দেখতে পেলনা। মিথ্যাই তার অনুসন্ধান। চোখদুটো আবার তার তাসের বাণ্ডিলের ওপর ফিরে এল। মনে মনে হিসেব করল, কোথায় লাবু থাকতে পারে। একবার মনে উঁকি মারল রান্নাঘরের কথা। হিসেবে যেন তার ভুল নেই। তাই জোর করেই ভাবল, এই সকালে রান্নাঘর ছাড়া আর যাবেই বা কোথায়? মনেব যুক্তিতে ভর করে, পায়ের শব্দ লুকিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল সে। লাবুর দেখা পাওয়া গেল। উনুনের সামনে বসে হাওয়া দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করছে। কাঁচা কয়লায় আগুন ধরে বড় দেরীতে। ধোঁয়ায় ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। মাথায় লাবুর কাপড় নেই। আদুড় পিঠ। আটহাতি কাপড়ে তার পুষ্ট দেহটা কোনোমতেই জড়ানো যায়না। কেমন বড় বেশী আঁটো সাটো মনে হয়। কেমন যেন বেশী উদ্ধত।

পেছনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখে বানেশ্বর। হাতের মুঠোয় তাসের বাণ্ডিলটা ঘামে ভিজে গেছে। বানেশ্বর ভাবে, সে কতক্ষণ লাবুর এই দুর্গতি দেখবে। ধোঁয়ায় লাল দুটো চোখ থেকে গালে

গড়িয়ে পড়া জল। তাই হঠাৎ সে কথা বলে ওঠে। কথার ভাবে মনে হয়, সে যেন আর দেখতে চায় না, দেখবে না আর এই দৃশ্য।

'থাক্ থাক্, উনুন জ্বালানো বন্ধ থাক একটু।' কথা শুনে হঠাৎ লাবুর শরীরটা নড়ে ওঠে। ঘাড়টা অল্প কাত করে, চোখ দুটো আড়ে রেখে পেছনে তাকাল সে। বানেশ্বরকে দেখে তাড়াতাড়ি পিঠের কাপড়ে ঘোমটা টানে। কিন্তু পিঠটা যেন তাতে আরো বেশী আদুড় হয়ে এলো। তবুও ঠোঁটদুটো হাসির রেখায় একটু বিস্তৃত। আর চোখ দুটো তেমন তির্যক রেখেই, কাঁধ দুলিয়ে প্রশ্ন করল :

'লজ্জা নেই নাকি তোমার। এমন সকাল বেলায় রান্নাঘরে আস? ডরও বুঝি নেই একটু!'

কিন্তু ভয় করবে কাকে বানেশ্বর। কাকে তার ভয়? সে যে ম্যাজিক দেখায়। খেলা দেখায় হরেক রকম।

আবার কথার সঙ্গে কথা যোগ করে লাবু।

'এদিক সেদিকে লোক দেখলে বলবে কি? নতুন বউ তো আমি। মেয়ে মানুষ। লাজ লজ্জা না হয় পুরুষেরই নেই। তা আমাদের—আমাদেরও কি—?'

'আমাদেরও কি লাজ লজ্জার বালাই থাকবে না। এই না তোমার কথা।' লাবুর অবশিষ্ট কথাটুকু বানেশ্বরই শেষ করে। কথার শেষে মুখটা একটু গম্ভীর। একটা ভুরু কাপালের রেখায় মিলিয়ে দিল। আর অন্যটিকে বার দুই নাচিয়ে নামিয়ে আনল চোখের পাতায়। তাসগুলোকে আবার শাফল্ করতে সুরু করল সে।

লাবুর চোখদুটো টানা টানা হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে সে ভাবে এত কথা দিয়েও বানেশ্বরকে তাড়ানো যায় না! দু'চোখে তার কৌতুক।

'লাজ আর ডর থাকবে কেমন করে, এ যে মেয়েমানুষের কাছে খেলা দেখানো। হত শতখানেকের আসর, তবে বোঝা যেত

বাহাদুরী। শুধু তাসে কি আর সেখানে চোখ ধাধানো যাবে? অনেক খেলা দেখাতে হবে। তবে তো লোকে খেলোয়াড় বলে মানবে।'

ঠোঁটদুটো এবার আরো ছড়িয়ে পড়ল তার হাসিতে। হেসেই সে অবার যোগ করল,

'আর মশায়, তাসেরই বা কোন খেলাটা জানেন?'

বানেশ্বর এবার, এই এতক্ষণে হাসল। তারপর টেনে টেনে বলল, 'সাত বছর ধরে খেলা শিখেছি। অন্য কারো কথা শুনিনি। এতটুকু ফাঁকি দেই নি শেখায়। আর আমায় তুমি বল, কোন খেলাটা জানি? বেশ কোন খেলা দেখতে চাও। কোন তাসের খেলা?'

এই বলে আর দ্বিরুক্তি না করে তাসগুলোকে প্রসারিত করে তুলে ধরল লাবুর সামনে।

'ধর ধর, একখানা তাস ধর দেখি।' বানেশ্বরের অসহিষ্ণু গলা।

লাবু একখানা তাস নেয়।

যাও, এবার কপালে জল লাগিয়ে এস। দেখবে তোমার তাস তোমার কপালে। হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করল,

'মনে আছে তো, কি তোমার তাস?'

'হাঁ, ইস্কাবনের বিবি।'

কপালে জল লাগিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালো লাবু। ক্রাস···সমস্ত তাসগুলো লাবুর কপালে ছুঁড়ে মারে বানেশ্বর।

কিন্তু কোথায়, কোথায় গেল ইস্কাবনের বিবি? এ যে রুইতনের গোলাম! বানেশ্বর হাসে।

'আমরা হলাম জাত খেলোয়াড়। মিথ্যা আমাদের কাছে টেঁকে না।'

এত-ও আসে বানেশ্বরের মনে। লাবু ভাবে। তবু যেন কি এক খেয়াল হয় তার। আবারো তার প্রশ্ন: 'ব্যস্, এই তাসের খেলাই শেষ। আর, আর কোন খেলাটা জান তুমি?'

'কি-না জানি ? তাসের খেলা হরেক রকম। কাঠের হাসের নাচন দেখাই জলে। দেখাই মাদারীর খেলা।'

'সে আবার কি ?' গালে হাত দিয়ে লাবু অবাক হয়।

'তা' বুঝি জাননা ?' মাড়িতে জিভ ঠেকিয়ে ঈষৎ শব্দ করে। যেন কত কৃপার পাত্র লাবু।

'এই খেলায় অনেক মানুষের সামনে একটি ছেলেকে ছোরা দিয়ে কাটি, সকলের সামনেই তাকে আবার বাঁচাই। তাকে মুরগী করে খাঁচায় ভরি। মানুষ করে ছেড়ে দিই।'

বিস্ময় প্রসারিত চোখ দেখেও নিশ্চিন্ত হয় না বানেশ্বর। তখনও সে থামে না। সমান লয়ে ঘোষণা করে চলেছে। তার অনেক খেলার ফিরিস্তি।

'আর জানি আংটির খেলা। তাও বোধ হয় দেখনি কোনোদিন, না ?'

লাবু ঘাড় নাড়ে। ভাসা ভাসা, বোবা চোখে তাকায়।

'সে খেলায় একটি আংটি নিয়ে রুমালের খুঁটে জড়াই। তারপর বেছে বার করি খেলা দেখা বাবুদের মধ্য থেকে সেয়ানা একজনকে। তার হাতে রুমালটা রাখতে দেই। তারপর কথায় কথায়, হ্যাঁচকাটানে রুমালটা ছিনিয়ে নেই। কিন্তু রুমালটাই তখন পাওয়া যাবে। আংটি আর নয়। সেয়ানা বাবুটিকে তখন আংটির কথা বলব। কিন্তু আংটি তখন তার কাছে কোথায় ? আমি তারপর তা' বার করব, তারই অথবা অন্য কোনো সেয়ানা ফুরফুরে বাবুর জামার পকেট থেকে।'

এবার বিস্ময়ে লাবু হার মানে। চোখদুটো তার চক্ চক্ করে। কিন্তু তার কি এমন দাঁড়িয়ে থাকলে চলে ? উনুন খালি পড়ে আছে। হেসে হেসে বলে,

'বুঝেছি তুমি খেলোয়াড়। মস্ত বড় খেলোয়াড়। তবে এখন তুমি যাও।'

এই বলে উনুনের কাছে এগিয়ে যায়। একটুখানি চলতে গিয়েও পিছু ফিরে তাকায় কয়েকবার। খাটো কাপড়। বারে বারে মাথা থেকে পড়ে যায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মাথার কাপড় ঠিক করে বলে,

'তবে তোমার খেলা বৌ, মেয়েদের কাছে। রান্নাঘরে। আসরে বুঝি নিষেধ আছে কোনো ?'

'উঁহু নিষেধ নেই কোনো। আর বেশী লোকের সামনেই তো সুবিধা আমার। কিন্তু কোথায় খেলা দেখাই বল ?'

'কেন, কেউ কি তোমার খেলা দেখাতে ডাকে না ?'

এমন একটি কথা বানেশ্বরও ভেবেছে অনেকদিন। কিন্তু সান্ত্বনা পেয়েছে এই ভেবে যে, একটা 'কল' তার আসুক। তারপর পশার হতে আর কতক্ষণ ?

'এবার হয়ত 'কল' একটা পেতেও পারি। বারোয়ারি পূজোয়, শিবতলার মাঠে। কথাবার্তা তো চলছে।'

লাবুর মুখে তবু কোনো খুশীর চিহ্ন নেই! কোনো প্রশ্ন না। ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়াতে ব্যস্ত সে। কি ভেবে বানেশ্বর চলে গেল।

সমস্ত দুপুর গাছের ছায়ার দৈর্ঘে প্রহর গুনল লাবু। বাড়ির পাশেই বড় তালগাছ একটা। সমস্ত উঠোন ভরে তার ছায়া পড়ে। অনেকক্ষণ আগে, সূর্য সোজাসুজি মাথার ওপর ছিল। এখন হেলতে সুরু করেছে। পশ্চিমের দিকে। লাবুর স্নান শেষ হয়ে গেছে। সে রান্নাঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে বসে। চোখদুটির পাতা বুঝি একবার ভারি হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ চমকে উঠল সদর খোলার শব্দে।

ঠিক তাই। লাবু যা' ভেবেছিল তাই। বানেশ্বর এসেছে। মাথার চুলগুলো উড়ুক্কু, উস্‌কো খুসকো। মুখটা শুকিয়ে গেছে। তবু যেন কেমন দরাজ মেজাজ তার। রান্নাঘরে এসে লাবুর মুখোমুখি

বসে হেসে ফেলল। লাবুর মনে হয়, লোকটা কেমন? ভর-দুপুরেও ক্ষিদে তৃষ্ণা নেই নাকি? এমন করে হাসে?

লাবুর কাছে, খুব কাছে বানেশ্বর বসেছে।

'আজ সব ঠিক করে এলাম।' বানেশ্বর বলল। 'পূজোর দু' রাত্রি খেলা দেখাব। বারোয়ারি তলায়। তারপর আমার আর ভাবনা কি? আমার খেলা—খেলা নয়, যাদু।'

এমন কথায় উৎসাহিত বোধ করার মত মনের অবস্থা তখন লাবুর নেই। তাড়াতাড়ি তাই বানেশ্বরের জবাবে অন্য কথার মোড় ধরল সে।

'থাক, এখন থাক ও-সব কথা। চান করে এসো তুমি। নাওয়া-খাওয়ার পর বল তোমার সব কথা। তখন শোনা যাবে।'

হাত ধরে টেনে বানেশ্বরকে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু গায়ে শক্তি যে তার চেয়ে বানেশ্বরের অনেক বেশী। কব্জির টানে বানেশ্বরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাবু।

লাবু আর মনের বল্গা ঠিক রাখতে পারে না। বানেশ্বরের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

'কেমন মানুষ গো তুমি! ক্ষিদে তৃষ্ণা নাই নাকি তোমার? এমন ভর দুপুরেও তোমার রঙ্গ বস যায় না!'

এতক্ষণে কথাটা বানেশ্বরের মাথায় ঢোকে। কথাটা ঠিক। এখনও লাবুর খাওয়া হয়নি। আর ক্ষিদে তো তারও লেগেছে।

নাওয়া খাওয়া শেষ করে একটুমাত্র সময় দিল বানেশ্বর। হাতের কাজ সেরে লাবুকে ঘরে আসতে হবে। ঘরে এসে তার কথা শুনতে হবে। এমন কি একটু শুতেও পাবে না পর্যন্ত। লাবুকে শুনতে হবে বানেশ্বরের খেলার গল্প। লাবুকে আসতেই হল, মাত্র সামান্য একটু পর। তারও যে খারাপ লাগে না শুনলে।

'জান, মাদারীর খেলা আর দেখান গেল না। ছেলেই পেলাম না একটা তেমন।'

আফশোষে ঠোঁট চাটে লাবু। ভাবে, তারিফ কি আর ততটা পাবে বানেশ্বর, যতটা পেত মাদারীর খেলা দেখিয়ে!

'তুমি যাবে না ?'

বানেশ্বরের গলা কেমন অস্পষ্ট শোনায়।

'না গেলাম এবার, একহাট মানুষের সামনে যেতে আমার ভারি লজ্জা। ভাল লাগে না! পাড়ার পূজোও তো সামনে। সেখানে তোমার ডাক হলে যাব।'

'তাই ভাল।'

আধ বোজা গলায় জবাব দেয় বানেশ্বর।

দিন কয়েক পর পূজো। খেলা দেখানোর দিন বানেশ্বরের। দু'দিন তাকে খেলা দেখাতে হবে। সকাল থেকেই তার তোড়জোড় চলেছে। আর মাঝে মাঝে লাবুকে বলছে। দরাজ গলার হুকুম। আরো এক কাপ চা। লাবু বিরক্ত হয়না একটুও। বরং চা দেবার ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি দেখে তার আয়োজনের মহড়া। বড় ইচ্ছে হয় তার, একটু একটু কাজ এগিয়ে দিতে, হাতে হাতে। লাবু অবাক হয়ে ভাবে, এত-ও নাকি লাগে খেলা দেখাতে। আর এত-ও কি পারে একটা মানুষ! মনের সাধ তার আরো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু কোন দিক সে সামলাবে। এদিক না ওদিক। কিন্তু ওদিক সামলাতেই সে যায়। কূল সামলাতে। বানেশ্বর লাট বহর নিয়ে তিনটে নাগাদ বার হবে। বিকেলে তার খেলা। তার আগে অন্তত কিছুক্ষণ তো বিশ্রাম দরকার মানুষটার।

রাত্রে গুন গুন করে গান ধরে বাড়ি ফিরল বানেশ্বর। সদর পার হতেই তার গান থামল। পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকলো। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে লাবু। একবার চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে, পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে এগিয়ে যায়। লাবুর চোখ টিপে ধরে। চোখ বন্ধ থাকা

অবস্থাতেই লাবু বানেশ্বরের হাতের ওপর হাত রাখে। বার দুই বানেশ্বরের হাতের আঙ্গুলগুলো অনুভব করে বলল :

'এ-ও কি তোমার খেলা, খেলোয়াড় সাহেব ?'

লাবুর কথায় হাত তুলে আনে বানেশ্বর।

'কেমন করে বুঝলে আমার হাত ?'

'ও-হাত কি ভোলার ? এ ত জানা হাত। তবে থাক এখন সে কথা। বল কেমন খেলা দেখালে, লোকে কি বলল ?'

লাবুর পাশে এবার বসে পড়ে বানেশ্বর। খুব কাছ ঘেঁষে।

'লোকে আর বলবে কি, বাহবা দিল।'

এমন নিস্পৃহ ভাবে কথা বলে সে যে মনে হয় যেন জানা কথারই পুনরাবৃত্তি করছে।

'আর জান ?' আগ্রহে আরো ঘনিষ্ঠ হয় বানেশ্বর। 'এ পাড়ার পূজোতেও খেলা দেখাব। পরশুদিন। আজ বায়না দিয়ে গেল।'

লাবু এক আবদ্ধ পাখীর মত মৃদু স্বরে বলল,

'এবার আমি যাব তোমার খেলা দেখতে।'

কয়েকটি নিঃশ্বাসে বুঝি দুটো দিন কেটে গেল লাবুর।

সেদিন বানেশ্বর খেলা দেখাবে মাঠে। পাড়ার মাঠের চারদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর সামিয়ানা। লাবুও এসেছে বানেশ্বরের সঙ্গে। একপাশে সে বসে আছে। মেয়েদের ভীড়ের মধ্যে। এমন পোষাকে আর লাবু বানেরশ্বকে কখনও দেখেনি। কালো কোট। কালো প্যান্ট। সব কিছুই কালো। মাথায় একটা রুমাল জড়ানো। বানেশ্বরের ভাব দেখে তার হাসি পায়।

আসরে লোকের ভীড়। হঠাৎ সকলের সামনে এসে দাঁড়ালো বানেশ্বর। একটুখানি চুপ করে থেকে, এক সময় সামনের দিকে হাত দুটো তুলে বলল :

'এখানে আপনারা সব ভদ্রলোক। চোর চামার কেউ না। তাই কেউ কিছু যে চুরি করবেন, এমন বিশ্বাস আমার নেই।'

খেলার সূচনায় এমন কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হল কিছুটা। এবার বানেশ্বর একটু একটু করে এগিয়ে এল সকলের সামনে। তারপর বেছে বেছে একজন বাবুর কাছ থেকে একটা আংটি চেয়ে নিল। অসমাপ্ত কথার সঙ্গে আবার কথা জুড়লো সে। সকলের দিকে আংটি তুলে ধরে এবার প্রশ্ন করল :

'এটা কি ?'

একাধিক কণ্ঠে জবাব এল।

'আংটি।'

বানেশ্বর এবার আংটিটা একটা রুমালের খুঁটে জড়িয়ে দর্শকদের দিয়ে একে একে পরখ করিয়ে নিল। তারপর রাখতে দিল আংটিটা অন্য একজনের কাছে। আবার বানেশ্বরের ছোট একটু বক্তৃতা :

'আপনারা সবে পরখ করেছেন আংটিটা। আর এ-ও দেখছেন,' আঙুল তুলে ধরল একজনের দিকে, 'ওই, ওই বাবুকে আমি আংটি রাখতে দিয়েছি।'—এই বলে হ্যাঁচকা টানে রুমালটা কেড়ে নিল বানেশ্বর। কিন্তু আংটি কোথায় ? যার আংটি তিনি যেন আংটি গচ্চা যাবার আশঙ্কায় কেমন ক্ষেপে উঠলেন। আর যাকে আংটি রাখতে দেওয়া হয়েছিল, সে ভয় পেল। এই দেখে বানেশ্বর হেসেই খুন।

'চটেন কেন বাবু, পকেট তালাস করুন, আংটি পাবেন।'

কিন্তু কোথায় আংটি, কে পাবে ?

বানেশ্বর বোঝে, কেরামতির এই হল সময়। একটু একটু করে সে এগিয়ে এল যার আংটি তার কাছে। তারপর তারই বুক পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে সকলকে দেখাল। আংটি তারই মধ্যে। 'একি বাবু, নিজের আংটি নিজেই চুরি করলেন। এ আবার কেমন চুরি ?'

চারদিক থেকে সপ্রশংস দৃষ্টি এসে বিঁধল বানেশ্বরকে। আর লাবু ভাবে, সত্যি বানেশ্বর—এত বড় খোলোয়াড় !

একে একে অনেক খেলাই দেখাল বানেশ্বর। আর প্রত্যেক খেলার শেষেই হাততালি। খেলা আরম্ভ হয়েছিল একটু বেশী রাতে। তাই সব খেলা আব তারপর দেখানো হল না। আগেই ফিরে এল।

খেলার শেষে খোলোয়াড়ের পোষকেই ফিরে এল বানেশ্বর। লাবু তখন দাঁড়িয়ে বারান্দায়। লাবুর যেন বানেশ্বরকে হঠাৎ কেমন অজানা, কেমন অচেনা মনে হল। তাই সে যখন তার কাঁধের ওপর বানেশ্বরের হাত অনুভব করল, চমকে উঠল তখন।

'কিন্তু,'—বানেশ্বর বলে, 'আমি আবার ভয় দেখাতেও পারি।'

'তোমাকে আবার ভয় কি ? হেসে উঠল লাবু, দু' কাঁধ দুলিয়ে।

বানেশ্বর আবারও যেন কি বলতে যাচ্ছিল। তার মুখে হাত চাপা দিয়ে লাবু তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। বাকিটুকু সে শুনল রাত্রে। শুয়ে শুয়ে।

লাবুর শক্ত অঙ্গুলগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে বানেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি তুমি ভয় পাওনা আমায় ? একটুও না ?'

'না একটুও না !' বানেশ্বরের লোমশ বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে জবাব দেয় লাবু।

'তুমি কি ভূত না বদমাইস, যে ভয় পাব ?'

'ভূত বদমাইসে ছাড়া কি আর কিছুতে ভয় নেই ?'

'না, আবার কিসে ভয় ?' কি ভেবে একটু টেনে টেনে লাবু বলে, 'আচ্ছা ভূত দেখানোর খেলা তুমি দেখাতে পারনা ?

'ভূত আবার আছে নাকি যে ভূতের খেলা দেখাব ?'

'এক টাকাও তো দশ টাকা হয়না, কিন্তু খেলায় হয়। ভূতের কি খেলা নেই ?'

বানেশ্বর এতক্ষণে ভাবে, হয়ত আছে। কিন্তু সে জানেনা। আর জানাও হয়ত কঠিন খুব। তবে তেমন তেমন ওস্তাদের কাছে

গেলে কি শেখা যায়না এই খেলা? তারা কি শেখায় না ভূত দেখানোর খেলা?

হঠাৎ কেমন চুপ করে যায় বানেশ্বর। শব্দ করে না। শুয়ে শুয়ে ভাবে।

'ঘুমাও নাকি?' অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ না পেয়ে লাবু জিজ্ঞাসা করে।

'না।'

'শোনো।' লাবু কথার জের টানে। 'আমার কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। একজোড়া কাপড় আনবে আমার জন্য?'

'দেখি।' বানেশ্বরের এমন জাবাবেও স্বস্তি পায় লাবু। এত ক্লান্ত সে যে তার দু'চোখের পাতা সিসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। ঘুম আসছে তার। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঘরের জানালা ভেঙে এসে চোখে মুখে পড়ছে। মোটা ঠোঁটদুটো লাবুর বন্ধ। লাবুকে সহসাই কাপড়ের ঘেরায় বানেশ্বরের আরও হাল্কা মনে হল। এক হাতেই যেন সে লাবুকে তুলে ধরতে পারবে। কি এক যন্ত্রণার আবেগে তার মুঠো বন্ধ হয়। তারপর আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এল তার মুঠো। কি আর এক ভাবনায় মুখ ফেরাল সে।

কিন্তু একি তার একার ভাবনা? সকলেই তো দেখেছে। বানেশ্বরকেও বলেছে। কে একটা লোক ঘোরা ফেরা করে। কেমন যেন হাসে। কথা বলে লাবুও নাকি। চোখের ইশারাতে। বানেশ্বর তো থাকে রাস্তা, ঘাটে। খেলা দেখাবার ফিকিরে। লক্ষ্য করবে কখন? বানেশ্বরের মনে হয় আজই যেন সে দেখেছে একটি লোককে, মাঠে। খেলা দেখতে মন নেই। লাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিল। আর লাবুই বা তাড়াতাড়ি চলে এল কেন? আর তার পেছন পেছন লোকটা! স্বস্তি পায়না বানেশ্বর ভাবনায়। ঘুম আসে না তার চোখে। আগামী কাল সকালেও নাকি

লোকটা আসবে। রোজ সকালেই সে নাকি আসে। পাশের ভাড়াটে তো তাই বলল।

অনেক কথার ঢেউ বুড়বুড়ি তোলে বানেশ্বরের মনে। আবার একবার ভাবল, ভূত না হয় সে লাবুকে নাই দেখাল। কিন্তু ভূতের ভয়ও কি দেখাতে পারে না? ভূত দেখানোর চমক! সারা দিন বাড়ি না ফিরে যদি রাত্রে এসে ঘর খুলে দাঁড়ায় লাবুর সামনে, তবু কি ভয় পাবে না লাবু, হঠাৎ তাকে দেখে? কিন্তু রাতের মেয়াদ আর কতটুকু? এত ভাবনার পরও কি রাত শেষ হতে বাকি থাকে?

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে লাবু আর বানেশ্বরকে দেখতে পায় না। ভাবনার অবশ্য কিছু ছিল না বানেশ্বর কালকেই বলেছিল, কোথায় যেন কি কাজ আছে তার। সকালে ঘর ঝাঁট পাট আর রান্নাঘরের কাজ সারতে সারতে লাবু দেখল, সকাল বেলাটা শেষ হয়ে এসেছে। রৌদ্র যখন খটখটে, সূর্য যখন সোজাসুজি মাথার ওপর, তখনও বানেশ্বরের দেখা না পেয়ে কেমন খারাপ লাগে লাবুর। মনে মনে ভাবে, এ আবার তার কেমন খেলা আরম্ভ হল!

দুপুরে রান্নাঘরে কাজ শেষ করে বারন্দায় এসে দাঁড়ালো লাবু। কার্নিশের ওপর স্পিরিটের বোতলে নারকেল তেল। রোদের তাপে গলে গলে জমাট ভাঙছে। হাতের পাতায় একটু তেল নিয়ে মাথার তালুতে চাপটা মেবে রাখল। একবার এদিক সেদিক তাকায়। চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। লাবু এবার স্পষ্ট দেখতে পেল সেই লোকটা, কদিন ধরে যে ঘোরাফেরা করছে, সদরে দাঁড়িয়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সে, আজ সব বানেশ্বরকে বলবে। তাড়াতাড়ি চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি করে করে তেল মাখে। হঠাৎ হাল্কা চাপা এক শব্দে মুখ ফেরায়। লোকটা আবার ঘরে ঢুকে না বসে থাকে। মনটা কেমন ছম ছম করে। কিন্তু পেছনে চোখ ফিরিয়ে সে নিজেই ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসে।

একি! লাবু ভাবে। কাপড়টা পেছনে এত ছিঁড়ে গেছে যে, লক্ষ্য করতেই পারেনি। এমন ভাবে কাপড়টা ছিঁড়েছে, লাবুর কানছুটো লাল হয়ে যায় দেখে। তাড়াতাড়ি কোনোমতে কাপড় ঠিক করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢোকে সে।

সকাল থেকে দুপুর। এখানে সেখানে টহল মেরে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল বানেশ্বর। সদর পার হয়ে বারান্দায় এসেই সে লাবুর খোঁজ করে। কিন্তু লাবু কোথাও নেই। না রান্নাঘরে, না বারান্দায়। তবে বোধ হয় ঘরে। বারান্দায় ঘটি আর গামছা। তেলের বোতলে তখনও তেল গলে গলে পড়ছে। কি এক কথার উঁকি তখন তার মনে। কপালে কেমন রেখা পড়ে ভাবনার। চোয়াল দুটো কেমন শক্ত।

একটু একটু করে এসে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কি এক খেয়ালে হাঠৎ দরজায় ধাক্কা দিল বানেশ্বর।

হাট করে দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে তাকাতেই বানেশ্বরের মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। বানেশ্বরের চমক বুঝি ভূত দেখারই মত। তাড়াতাড়ি অবার দরজাটা বন্ধ করে দেয় বানেশ্বর।

লাবু হয়ত দরজা খোলার শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কাপড়টা কি এখনও তার হাতে? এখনও কি গা থেকে খুলে কাপড়টা সেলাই করে চলেছে সে?

শিমুল ফুলের ছায়া

এই একটু আগে, প্রিয়তোষের ঘর থেকে এ ঘরে এসেছে তারা। খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে এল। তারপর ও-ঘর থেকে দৌড়ে, যেন ঝড়ে-পড়া পাখির মত এ ঘরে ঢুকেছে সে। ঠিক ঝড়ে-পাওয়া পাখি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, তার ডানা দুটো ভাঙ্গা। বিস্রস্ত চুল। এলোমেলো শাড়ি। তার অনেকখানি মাটিতে লুটিয়ে। কোনোভাবে এসে তারা চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসেছে।

সুধাময় অফিসে চলে গেছে। যাবার আগে সময় পায় না সে। কিছুটা কাজ তখন তার। সুধাময়ের হাতে হাতে সে এগিয়ে দেয় ওয়ালেট, সিগারেটের কেস। পকেট হাতড়ে দেখে, দিয়াশলাই ঠিক আছে কি না? এমন কি কোটের বুক পকেটে পরিপাটি রুমালের উঁকি মারাটুকু পর্যন্ত সযত্নে গুছিয়ে দেয় তারা। একটি সিগারেট ধরিয়ে, দু' একটা লবঙ্গ আর এলাচ দানা মুখে পুরে অফিসে বেরিয়ে যায় সুধাময়। এইটুকু, এইটুকু মাত্র তারার কাজ। অফিসের আগে, কিছুক্ষণ। আর কিছু দেখতে হয় না তাকে।

তারপর তারার অফুরন্ত সময়। সে গিয়ে তখন বারান্দায় দাঁড়ায়। সামনে, তাদের দোতলার ফ্লাটের সামনে পার্ক সার্কাস ময়দান। সেদিকে তাকায়। কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটির দিকে। অথবা যে দিন ভাল লাগে, বারান্দার ময়নাটাকে ছোলা দেয়। আর শিস দেয় তার ঠোঁটের কাছে মুখ এনে।

কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম। সুধাময় অফিসে যাবার আগে, তারাকে বলেছে, সকালে খবরের কাগজটা রোজ প্রিয়তোষকে পড়ে শোনাতে। কাগজের লোক। খবরের মধ্যেই ওদের নিঃশ্বাস। তারা যেন ও-টুকু করে।

তারার মুখ যেন তখন এক পাণ্ডুলিপি। অসংখ্য কথা লেখা সেখানে। সুধাময় তা পড়তে পারেনি। দেখেনি পর্যন্ত। যেটুকু বলার বলে অফিসে চলে গেছে।

এবার এলাহাবাদের ট্যুর সেরে ফেরার সময় সুধাময় প্রিয়তোষকে নিয়ে এসেছে। সুধাময়ের সেই স্বল্প অনুপস্থিতিতে তারা গিয়েছিল তার দিদির বাড়ি। এমনটি সে করে।

সুধাময়ের খবর পেয়ে আজই সে এসেছে। সকালে প্রিয়তোষের সঙ্গে সুধাময় পরিচয়ও করিয়ে দিতে পারেনি। আর তারারও তেমন উৎসাহ না দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল সুধাময়। তার মনে হল, কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে তারা। এমনকি বাড়ির অতিথিটির নাম পর্যন্ত জানতে চাইল না। শুধু অনেক কালের অভ্যাসমত হেসে হেসে ঘাড় নামাল। খুব মৃদু-স্বরে বলেছিল, বেশ তো। কাগজ পড়ে না হয় শোনাব।

হঠাৎ কয়েকদিন আগে প্রিয়তোষের সঙ্গে সুধাময়ের দেখা। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার।

বাঁকুড়া কলেজে ওরা চার বছর একসঙ্গে পড়েছে। দু'জন দু' প্রান্ত থেকে এসেছিল ওখানে। সুধাময় সায়েন্সের ছাত্র, প্রিয়তোষ পড়ত আর্টস।

তবু ওদের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। কলেজে ডিগ্রী কোর্স শেষ করে আবার দু'জন দুই গ্রহান্তরে ছিটকে গেল।

এক তেল কোম্পানীর চাকরি নিয়ে সুধাময় চলে গেল বোম্বাই। সেখান থেকে অল্প কিছুদিন হল সে এখানে, কলকাতার অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। প্রিয়তোষ এসেছিল কলকাতায়। এম এ পড়তে। পাশ করার পর ও কোথায় যে গিয়েছিল, কি করছিল, সে খবর আর সে কাউকেই জানায় নি। সুধাময়ও জানত না। অবশেষে এলাহাবাদে তার দেখা পাওয়া গেল খবরের কাগজের অফিসে।

সুধাময় গিয়েছিল এলাহাবাদে। একটি নতুন ডিপো খুলতে। কাগেজর অফিসে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে হঠাৎ একেবারেই আশ্চর্যভাবে সে আবিষ্কার করল প্রিয়তোষকে। চারিদিকে বিভিন্ন কাগজের ফাইল। তার মধ্যে বসে, মাথা নামিয়ে সে লিখছে। চোখে তার চশমা। একটি কাঁচ নীল।

এই অভাবিত সাক্ষাতে কেমন উচ্ছল হয়ে উঠেছিল সুধাময়। হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়েছিল। শক্ত হাতের মুঠোয় প্রিয়তোষের শীর্ণ হাত।নিয়ে, দু' চোখে ঘন রহস্য তার, বলেছিল: 'চিনতে পারেন?'

'চিনতে না পারার কিছুই ছিল না। সেই সুধাময়। হস্টেলের আর খেলার মাঠের। সবই ঠিক আছে। শুধু মুখে কয়েকটি রেখার ব্যতিক্রম।

তবে কথার জোয়ার এখনও তেমনি। অল্প সময়ের মধ্যে তার বিগত বছরগুলির সব কথা প্রিয়তোষকে বলেছিল। তারপর হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল, প্রিয়তোষ প্রায় কিছুই বলছে না। ঠিক আগের মত চুপ করে কথা শুনছে। তাই হঠাৎ নিজের কথা থামিয়ে বলল, 'কিরে চোখে আবার তোর কি হল? নীল ঠুলি পরেছিস। বয়স হয়েছে, নইলে এমন কথা বলতাম যে, লজ্জা পেতিস।'

প্রিয়তোষ একটু হেসে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল পরে।

একটি চোখের টিস্যু শুকিয়ে গেছে প্রিয়তোষের। চোখটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। আর একটা চোখও এমনি করেই নষ্ট হবে। অথচ এর কোনো চিকিৎসা নেই। ইঞ্জেকসন একটা চলছে।

ম্লান হেসে প্রিয়তোষ পরে বলল, 'কলকাতায় নাকি একজন খুব ভাল চোখের ডাক্তার এসেছেন। দিনকয় থাকবেন। তাকে একবার দেখাবার কথা ভাবছি। কতকাল যাইনি কলকাতায়। প্রায় অচেনা হয়ে গেছে শহরটা। একা যেতে সাহস হয় না।'

সুধাময়ের হাসি পেল কথা শুনে। এখনও প্রিয়তোষ তেমনি আছে। প্রিয়তোষের কাঁধে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'আমি যে কলকাতায় থাকি, সেকথা কি তুই এই দশ মিনিটের মধ্যেই ভুলে গেলি?'

তারপর আর কোনো কথা শোনেনি সে। জোর করে প্রিয়তোষকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে। নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। অন্য চোখটাও এখন তার চশমার নীচে। নীল কাপড়ে ঢাকা। এখন একেবারেই অন্ধ সে। যে-চোখে দেখতে পায় না, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেখানে পাথরের চোখ বসানো। একদিন আয়নার সামনে নিজের চোখ, মৃত মাছের মত চোখ দেখে চশমায় নীল লেন্স বসিয়েছিল। এখনও তাই আছে। হঠাৎ দেখলে বুঝতে পারবে না কেউ, প্রিয়তোষের চোখটি দৃষ্টিহীন কি-না। ভাববে নীল চশমার নীচে, নিশ্চল চোখটি সব কিছুই দেখে।

তারারও তাই মনে হয়েছিল।

ঘরে ঢুকে হঠাৎ তারার পা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছিল। আর এক পা-ও সে যেন চলতে পারেনি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। বাইরের ঘরে ক্যানভাসের ইজি চেয়ারটায় কাত হয়ে কেমন যেন কঁকড়ে শুয়ে প্রিয়তোষ। মুখে সেই ম্লান হাসি। এ হাসি তারার চেনা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা যখন ফিরে যাবে ঠিক করেছে, তখন হঠাৎ কিসের শব্দে প্রিয়তোষের চমক ভাঙ্গে।

তারা বুঝতে পারে, নীল কাঁচের আড়ালে চোখটার আর দৃষ্টি শক্তি নেই। আর, আর একটা চোখ তো তার ঢাকা। নীল কাপড়ের নীচে। বাইরে জানালার পাশে, শিরীষ গাছের জাফরিকাটা পাতায় হঠাৎ বাতাস লাগল।

তারাই বলে, 'উনি বলে গিয়েছিলেন্ কাগজ পড়ে শোনাতে। তাই এলাম। এখন সবে বারোটা। আপনি যদি বিশ্রাম করেন তো না হয় পরে আসব।'

চেয়ারের হাতলুটোয় কনুইয়ের চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল প্রিয়তোষ। হাসিকে ছু'ঠোঁটের কোণায় বিস্তৃত করে বলল, 'আপনার অসুবিধা না হলে এখুনি বসুন। কাগজের খবর না জানলে খারাপ লাগে ঠিক। কিন্তু তার চেয়ে খারাপ লাগছে, এমন করে চুপচাপ কোনো কথা না শুনে বসে থাকতে।'

আর কোনো কথা বলেনি তারা। কোলের কাছে কাগজটা টেনে এনে পড়তে আরম্ভ করেছিল।

এই একটু আগে তারা প্রিয়তোষের ওখান থেকে এসেছে। কেমন যেন ঝড়ে-পাওয়া চেহারা তার? চেয়ারে বসে একবার বাইরে তাকাল। এপ্রেলের রৌদ্রে কেমন উজ্জ্বল সুন্দর দিন। তবু যেন তার মনে হল, সব পুড়ে যাচ্ছে তার। জ্বলে যাচ্ছে।

ঠিকই চিনছে তারা প্রিয়তোষকে। সেই প্রিয়তোষ। বাঁকুড়া কলেজ থেকে এসেছিল কলকাতায় পড়তে। ইংরেজির ছাত্র। তারাও তাই। পড়ত তার এক ক্লাস নীচে। ওদের দেখা হল এক সিম্পজিয়ামে। তারাকে না দেখে উপায় নেই। ঘাড় ছাঁটা বব করা চুল। সিফন অথবা নাইলনের শাড়ি। গায়ের রঙ-এর সঙ্গে মিল দিয়ে জামা। পায়ের নখ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত সবই মাজা-ঘষা।

হ্যাঁ, প্রিয়তোষও দেখেছিল তারাকে। অন্য আর আর ছাত্রদের মত। আর প্রিয়তোষকেও দেখল তারা। দেখতেই হল তারাকে। প্রিয়তোষ যখন উঠে দাড়াল সকলের সামনে বক্তৃতার জন্য।

তারার মনে পড়ে, আস্তে, থেমে থেমে কথা বলেছিল প্রিয়তোষ। হাতে তার লেখা বক্তৃতা।

একটু একটু করে সব মনে পড়ে তারার। দশ বছর আগের ঘটনাগুলি। চৈত্র মাসের খসে-পড়া পাতার মত একটি একটি কথা শুকনো বর্ণহীন। তারার সামনে ঝরে ঝরে পড়ল।

পরের দিন প্রিয়তোষের কাছে গিয়ে তারা বলেছিল, সে তখন

ওয়াল পেপারের 'এডিটর', লেখাটা আমাদের দিন। ওয়াৎ বাতাসে যেন জন্য।' একটু মৃদু স্বর গলায়, অকারণে ঠোঁট কেঁপেছিল এবং কাছ ঘেষে,

ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছিল প্রিয়তোষ, একটু হেসে তারপর এ হাসি তারার অচেনা নয়, দেখে মনে হয় বিদ্রূপ করছে। বলেছিল 'আপনার পাঠক সংখ্যা কমে যাবে তাহলে।'

তারা একথার অর্থ বুঝেছিল। তার মুখে কেমন বিবর্ণ ছায়া। প্রিয়তোষের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বলেছিল, 'আপনার এমন কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না।'

কথা শুনে প্রিয়তোষ থমকে দাঁড়াল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল তারার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তার, কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে তারার মুখের রঙ। অত প্রসাধন সত্ত্বেও। তখন আর কিছু বলতে পারেনি প্রিয়তোষ।

পরের দিন সমস্ত লেখাটা ভাল করে টাইপ করে এনে নিজেই প্রিয়তোষ তারার হাতে পৌঁছে দিল। একটা কিছু উত্তর দেবার জন্য তারা লেখাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। একবার ভাবল ফিরিয়ে দেবে কিনা। কিন্তু কোনো উত্তর তার মুখে এল না। তার মনে হয়েছিল, অনেক খুঁজলেও ঠিক উত্তরটা তখন আর মুখে আসবে না। প্রিয়তোষের কথা আর ফিরিয়ে দিতে পারল না তারা।

এক এক করে তার আরো কথা মনে পড়ে। এ যেন কোনো ফাল্গুন মাসের পাতা ঝরা গাছে নতুন-কচি-লাগা সবুজ পাতার মত।

মনে পড়ে তারার সেই দিনের কথা যেদিন প্রিয়তোষের সঙ্গে সে প্রথম বাইরে বেড়িয়েছিল।

ঘটনাটা এখনও তার চোখের সামনে স্পষ্ট। অনেক বর্ণে উজ্জ্বল। স্পেশ্যাল পেপারের ক্লাসে যাবার পথে প্রিয়তোষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা। জোরে ঝাকুনি দিয়ে চুলগুলি পিছনে সরিয়ে

দিয়েছিল। বলেছিল, কি যেন বলেছিল? এখনও একটি কথাও তার ভুল হয়নি।

'চলুন না নিউ এম্পায়ারে। সেক্সপিয়রের নাটক দেখে আসি। আজ "ওথেলো" হবে।'

কিন্তু অবাক হল তারা। কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষকে রাজি হয়ে যেতে দেখে।

তারপর, তারা এখনও অনুভব করে, তারপর যেন এক নিঃশ্বাসে কেটে গেল তাদের অনেকখানি সময়। অনেকগুলি মুহূর্ত। থিয়েটার দেখেই ফিরে গেল না। রেড রোড ধরে অনেক, অনেকখানি পথ হাঁটল। এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসল আউটরাম ঘাটে। মানুষের ভিড় তখন সেখানে ফিকে। একটি ঝাউ গাছের নীচে তখন অন্ধকার বিষণ্ণ। ওরা ওখানে গিয়ে বসল। গঙ্গার ঢেউগুলির ওপর অন্ধকার চুয়ে চুয়ে পড়ছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল তারা। মৃদু বাতাসে তার কপালের চুল উড়ছিল। এক আঙুলে কয়েকটি চুল সরিয়ে সে প্রিয়তোষের দিকে তাকাল। তারার মনে হয়েছিল কি রুক্ষ!

আর কোনো কথা না বলে দুজনেই উঠে গেল।

তারপর কোথায় না গিয়েছে তারা। দু' জন। কত চায়ের দোকানে। কত ছোট ছোট পার্কের জনবিরল প্রান্তে!

চৈত্রের পড়ন্ত দুপুরে বাইরে তাকায় তারা। কৃষ্ণচূড়ায় লাল হয়ে আছে গাছের শিয়র। তার পাশেই ব্যতিক্রম সংযোজনা, রঞ্জন ফুলের। ছবির মত হলুদ বর্ণের ফুল, থোকা থোকা ফুটে। দুপুরে রৌদ্রের রঙ মনে হয় ওই রঙের সঙ্গে মিলে আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

অনেক আগে, একদিন সন্ধ্যায় ওরা ওখানেই এসেছিল। তার আগে দিন দুই ক্লাসে আসতে পারেনি প্রিয়তোষ। প্রিয়তোষের একটি হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলেছিল তারা, 'কেন তুমি জানাওনি, চোখের জন্য ইঞ্জেকসন নিচ্ছিলে।'

কয়েকটি কৃষ্ণচূড়ার পাতা ঝরে পড়ল। হঠাৎ বাতাসে যেন তারাকে উড়িয়ে দিল কোথাও। প্রিয়তোষের কাছ ঘেষে, প্রিয়তোষের হাত আরো শক্ত করে ধরে বসেছিল তারা। তারপর বৃষ্টি নামল।

তারার কথায় প্রিয়তোষের শরীরে যেন কি শিহর। ভাঙা ভাঙা গলায়, আস্তে আস্তে যেন কয়েকটি কথার টুকরো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে আনল প্রিয়তোষ। বলেছিল, 'আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। আমি তোমার চোখ দিয়ে দেখব।' একটু থেমে। 'তুমিই তো আমার নয়ন।'

তারা—অর্থাৎ নয়নতারা কোনো কথাই বলতে পারেনি। মুখ চাপা দিয়েছিল প্রিয়তোষের।

তারা তখনও জানত না, একদিন সত্যিই প্রিয়তোষকে নির্ভর করতে হবে তার দৃষ্টির ওপর। চৈত্রের এই পড়ন্ত দুপুরে এই ভেবে তারা অবাক হয়, মানুষ যা বলে তা যেন তার জীবনের শেষ সিদ্ধান্তের মত। আর সেই কথার চাকাতেই সে ঘুরে চলে। কেন এমন হয়, আর কতদিনই বা এমন করে চাকার আবর্তে সে চলবে, কেউ বলতে পারে না। সে নিজেও না।

আর একদিনের কথা মনে পড়ল তারার। এ যেন সাপের খোলস ত্যাগ করা। এক একটি ঘটনার খোলস ছেড়ে চলেছে তারার ভাবনা। তারার মন। আর সেই সঙ্গে সে অনুভব করল, কি অস্থির, অসহ্য যন্ত্রণার দাহ। তারার মনে হল, দিনের পড়ন্ত বেলার সবটুকু আঁচ যেন তার মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

প্রিয়তোষের পরীক্ষার তখন মাত্র মাস দুই বাকি। তার ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। দুপুরে ক্লাস না করে তারা গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রিয়তোষের মেসের ঘরে। বুকের নীচে বালিশ দিয়ে পড়ছিল তখন প্রিয়তোষ। খুব সন্তর্পণে কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকেছিল তারা।

তার দিনকয় আগে, কথায় কথায় বলেছিল, কয়েক দিন ক্লাসে

আসতে পারবে না সে। এক সপ্তাহ যেন ছুটি দেয় প্রিয়তোষ। সিমলা থেকে এক ভদ্রলোক আসবেন তাদের বাড়ি। তাদের পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি। আর এমন গল্প আর হৈ চৈ করতে ভালবাসেন যে, তারা যে ছাড়া পাবে, এমন ভরসা কম। তারা এখনও ঠিক মনে করতে পাবে। স্মরণ করতে পারে, এই কথাগুলি বলতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল তার। সে কাঁপুনি থামাতে অকারণে কয়েকবার সে বুকে হাত রেখেছিল। হাত দুটো তার ঘেমে উঠেছিল। আর যদিও সামনে আয়না ছিল না, তবু তারা তখন বুঝতে পেরেছিল, তার মুখের চেহাবা বদলে গেছে। আর বুঝি সে-টুকু গোপন করতেই হেসে বলেছিল, 'ভালই হল। এ কটা দিন তোমাব অনেকখানি পড়া এগিয়ে যাবে প্রিয়।' হ্যাঁ, প্রিয়তোষের শেষের দুটি অক্ষর বাদ দিয়েছিল তারা, শেষের দিকে।

সন্ধ্যার পব, অন্ধকার তখন গাঢ়—আউটবাম ঘাটেব ভিড় অনেক ক্ষীণ, গঙ্গাব জলে ঢেউগুলি এক একটি রূপাব পাতেব মত মনে হয়। একটি বিরল-পত্র-গাছেব নীচে ওরা তখন বসে। হঠাৎ হাটুতে মুখ গুজে কেঁদে উঠেছিল তারা। সমস্ত শরীরটা তাব ধনুকের জ্যার মত। বার বাব কেঁপে কেঁপে উঠেছে। কিছুই তখন বলতে পারেনি প্রিয়তোষ। শুধু বোবাব মত, বোকার মত তাকিয়েছিল। আরো কিছু পরে কেউ কোনো কথা না বলে উঠে এল। তারার মুখের বঙ তখন ধুয়ে গেছে। কাজলের কালি লেগেছে গালে, কপালে।

একটি একটি করে বুঝি তারা একটি ফুলেব, তার ভাবনার ফুলের, সমস্ত পাপড়িগুলি খসিয়ে ফেলল। এখন শুধু গুটিটাই আছে। কদর্য মৃত একটি পোকার মত গুটি।

সিমলার সেই ভদ্রলোক, সুরজিত সিং-এর কথা সব তারা বলেনি প্রিয়তোষকে। কিন্তু সে জানত, মাঝে মাঝে সে কেন কলকাতায় আসত। তার বাবা বলতেন, ব্যবসার কাজে। যে-ব্যবসায় তার

বাবাও পার্টনার। কিন্তু তারা জানতে পেরেছিল, আমদানী আর রপ্তানির সেই কারবারে তার বাবা আর তখন কেউ নয়। সবটাই সুরজিতের। অন্ধকার পথে আসা টাকার মুঠো মুঠো তার বাবাকে দিয়ে সে বলেছিল, বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম নিতে। তারার বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন, সমস্ত কিছু ঠিক করেই সুরজিত ওকথা বলেছিল। পাতিয়ালার এই পাঞ্জাবী যুবকটির বুদ্ধির কাছে পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল তারা। তারার তখন ষোল বছর বয়স।

সুরজিত তার কথা রেখেছিল। মাসের প্রথম দিকে একটি ইন্সিওর করা খামে নিয়মিত টাকা এসেছে। এর ব্যতিক্রম কখনও হয়নি। আর সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে একটি চেক আসত বাড়িওয়ালার কাছে। তারাদের কি ছিল? সেই সুন্দর সুদৃশ্য ফ্ল্যাটটাও তো ছিল সুরজিতের নামে। এই দীর্ঘ আট বছরে কখনও এই নিয়মের এদিক ওদিক দেখেনি তারা।

কিন্তু এই মাসোহারা শোধ করতে হয়েছে তারাকে। তার অনেক সময় দিয়ে। তার মনের, শরীরের অসহ্য গ্লানির পরিবর্তে। সিমলা থেকে আসার পর প্রথম যেবার সুরজিত কলকাতায় এল, সেবার সে তারার বাবাকে বলেছিল, তখন থেকে তারা তার নতুন পার্টনার। ওয়ার্কিং পার্টনার। দোকান থেকে নিয়ে এসেছিল নাইলন আর সিফন। অপূর্ব নক্সায় আঁকা নানা রকমের চোলি। তারপর পার্ক ষ্ট্রীটের এক দোকানে গিয়ে তার চুলগুলোকেও কাটিয়ে নিয়ে এসেছিল।

আপত্তি থাকলেও তারার বাবা কখনও কিছু বলেননি তা নিয়ে।

আর সেই বয়সেই তারা জেনেছিল, ককটেল পার্টির লোকগুলিকে, তাদের হাসির উৎস কোথায়। কোন হোটেলে কে ক্রুনার, তার নাম; কোন অ্যাক্রোব্যাটের দেহের কি বৈশিষ্ট্য, এমন কি তা' পর্যন্ত।

মনে আছে তারার, সুরজিত সেইসব মুহূর্তে তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে ফিস ফিস করে। কোন ভদ্রলোক কয়লার পারমিট দেওয়ার মালিক, কে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কণ্ট্রোলার। সুরজিত জানত, কোথায় কে কখন আসবে।

ইউনিভার্সিটিতে এসে ভিন্ন পরিবেশে, প্রিয়তোষকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল তারা। তার মনে হয়েছিল, কত কথা সে যেন তাকে বলতে পারে। আট বছর পর, তাই বুঝি প্রথম সেদিন হাঁটুতে মুখ গুঁজে কি যন্ত্রণায় কেঁদেছিল সে।

আর, আর আট বছর পর, বৃদ্ধ লোম ওঠা কুকুরের মত একদিন চীৎকার করে কাতরাতে কাতরাতে তারার বাবা সুরজিতকে বলেছিলেন, সে যেন তারাকে নিয়ে ও-ভাবে ঘুরে না বেড়ায়। লোক দেখানো হলেও যেন তারাকে বিয়ে করে ফেলে।

কথাটা হয়েছিল সন্ধ্যার পর। তারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। মাত্র তখনই সে প্রিয়তোষের মেস থেকে ফিরে এসেছে। অদ্ভুত বিষণ্ণ তার মুখ। আর অদ্ভুত শূন্য মনে হচ্ছিল তার নিজেকে।

বাবার কথা শুনে কেঁপে কেঁপে তার শরীরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। দেখল তার ঠোঁটদুটো হাসিতে এঁকে বেঁকে গেল। যেন দুটো জোঁক রক্তের জন্য নড়ে চড়ে উঠল।

সুরজিত তারার বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল অমন অসম্ভব কথা আর কখনও না বলতে। আর বলেছিল, সেদিনই সে তারাকে নিয়ে সিমলায় যাবে। রাত্রের ট্রেনে।

কথার সবটুকু তখনও তারার কানে যায়নি। ভাবছিল দুপুরের কথা। প্রিয়তোষের মেসের ঘরের কথা। একটি ছবির অনেকগুলি ধূসর রেখা তার চোখে তখনও স্পষ্ট।

বুকের নীচে বালিশ দিয়ে তখন পড়ছিল প্রিয়তোষ। খুব

সন্তর্পণে, ভেজানো দরজা ঠেলে, প্রায় শব্দ না তুলে ঘরে ঢুকেছিল তারা। আর ঘরে ঢুকে, বাইরের পৃথিবী থেকে নিজের জগৎকে আলাদা করে আনতে কপাট বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঘরের বারান্দা পার হয়ে ফুটপাথ। একটু এগিয়ে ঝাউ আর রেন ট্রি। লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে দেয়ালে। এঁকে বেঁকে। হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে। মে মাসের সেই দুপুরে হঠাৎ এক এলোমেলো বাতাস এসে সমস্ত ঘরটাকে কেমন অগোছালো করে তুলল। প্রিয়তোষের মনকেও।

উঠে বসে, দু'হাতে সে তারাকে জড়িয়ে ধরল। তার কপালে, গালে, বুকে এবং ঘাড়ে অসহ্য যন্ত্রনায় মুখ ঘষতে ঘষতে কি-যেন বলল। অস্পষ্ট ভেজা, নরম স্বর। এলোমেলো কথা।

কয়েকটি মুহূর্ত, মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে তারা কিছু বুঝতে পারেনি। সেই মে-দুপুরেব বাতাসের গরম নিঃশ্বাস ছাড়া। তারপর প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙ্গে বসল চৌকির পাশে। কান্নায় ভেঙ্গে গিয়ে বলল, 'এ তুমি কি করলে? এ কি করলে তুমি! তোমরা পশু। সকলেই পশু।' কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর।

প্রিয়তোষ কিছু বলার আগেই, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল তারা। লজ্জায় অপমানে প্রিয়তোষের সমস্ত পৌরুষ যেন তখন টেবিলের কোণায় মাথা খুঁড়ে মরছে। তারা যাবার সময় প্রিয়তোষ টেবিলের ওপর থেকে, কনুই-ভাঙ্গা কোণ থেকে মাথা তুলে তাকাতে পারেনি পর্যন্ত।

অর্কেস্ট্রার বিষণ্ন সিম্ফনির একটানা সুর যেন চকিত একটি বাসের দ্রুত নিনাদে ভেঙ্গে গেল। তারার ভাবনায় ছেদ পড়ে সুরজিতের কথায়। একটুও সময় না দিয়ে তাকে তৈরী হয়ে নিতে বলেছিল সুরজিত।

যাবার সময় তারার বাবা সুরজিতের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে

বললেন, 'ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই কর। শুধু ওকে বিয়ে কর তুমি। এটুকু সম্মান ওকে দাও। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

তারা জানত, ওর কোনো জবাব সুরজিত দেবে না। দেয়ও নি। কিন্তু তারার বাবা যেন এক মিথ্যার মৌতাতে ঢুলছিলেন। তারার বন্ধুদের, এমন কি প্রিয়তোষকেও তিনি জানিয়েছিলেন, সুরজিতের সঙ্গে তারার বিয়ের কথা। ওঁদের সিমলা যাওয়ার কথা।

প্রিয়তোষ খবরটা জেনেছিল, তারার চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে। কিছুকাল পর সে-ও কলকতার পাট উঠিয়ে চলে গেল।

তারাও আর কলকাতায় ফেরেনি। তার বাবা তাকে লিখেছিলেন, আর না ফিরতে। নিজের প্রতিবেশীর কাছে, বন্ধুদের কাছে অন্তত এই মিথ্যে সম্মানটুকু তাঁর বেঁচে থাক। আর একান্তই যদি ফিরে আসার মত অবস্থা হয়, তার আগে যেন তারা আত্মহত্যা করে।

ততখানি মনের জোর তারার ছিল না। যে-শরীরকে সে ঘৃণা করত, সে-শরীরের ওপর কেমন এক অদ্ভুত মমতা তার। মনে প্রাণে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে সে সোজা বোম্বে চলে গিয়েছিল। সেখানে এক তেল কোম্পানীতে চাকরি করতে করতে সুধাময়ের সঙ্গে আলাপ, তারপর বিবাহ। এই যেন অবশেষে চেয়েছিল তারা। ক্লান্ত, অবসন্ন তারা যেন ছায়া খুঁজে পেল।

তারপর দীর্ঘ এতদিন পর আবার তার প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা। আর এখন সে নয়নতারার চোখ দিয়েই বাইরের জগৎকে দেখছে।

বৈশাখের বেলা ফিকে হয়ে এল। গাঢ় সোনালী থেকে ঈষৎ কমলা রঙ-এ। বাইরে তাকিয়ে কি যেন মনে হল তারার। এলো-মেলো কাপড় সযুত করে, হিটারে চায়ের জল চাপাল।

ভারি চটির গোড়ালি যেন আছড়ে পড়ছে প্রিয়তোষের [illegible] সমস্ত ঘরময় পায়চারি করছে। খুট খুট, খুট খুট শব্দ। তারার মনে হয়,

তার পাঁজরের হাড়গুলি, কাঠঠোকরা পাখির মত কেউ কুরে কুরে ফোকর করছে।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে তারা লক্ষ্য করল, তখনও প্রিয়তোষের ঠোঁট হাসিতে বেঁকে আছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, দেখুন তো, পার্কের পশ্চিম দিকে এখনও কৃষ্ণচূড়ার গাছটা ঠিক আছে কি-না? এখন তো মে মাস। নিশ্চয়ই অনেক ফুলে গাছের মাথাটা লাল হয়ে আছে।

জাফরি কাটা, চিরল চিরল যে পাতা ঝরে পড়েছে, ফুলগুলোকে ফুটতে দিয়ে, তার কথা জিজ্ঞাসা করল সে। তারারও মনে পড়ে। কথা শুনে আবার মনে পড়ল এই গাছটির কথা। এরই নীচে বসে অনেক, অনেকদিন আগে প্রিয়তোষ তারাকে বলেছিল, তোমার চোখ দিয়ে যেন চিরকাল দেখতে পাই নয়ন।

সহসা কি কথা যেন তারার মনে উঁকি মারে। হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ হয় তারার। এতদিন পর, সব জেনে প্রিয়তোষ কি তাহলে তাকে সেই পুরনো কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছে? অথবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। একটি একটি করে সে সব কথা বলবে সুধাময়কে।

তারার মন কেমন যেন করে উঠল। মনে হল, কিছুতেই সে মাটিতে পা রাখতে পারছে না। কেমন পিছল যেন মাটি। তারপর হঠাৎ তার চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠল। না সে কিছুতেই এমন ঘটতে দেবে না। অনেক যন্ত্রণার পাহাড় পার হয়ে, অনেক লবণাক্ত জলের আস্বাদ পেয়ে পেয়ে, এতদিনে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে একটু।

ও-ঘর থেকে সরে, আবার এ-ঘরে চেয়ারে এসে বসল তারা। কতক্ষণ চেয়ারের পিঠে মাথা গুঁজে বসেছিল মনে নেই। সুধাময়ের গলার আওয়াজে সে উঠে দাঁড়াল।

তারাকে এর আগে কখনও এমন আর দেখেনি সুধাময়। বিস্রস্ত চুল। এলোমেলো কাপড়। প্রসাধনের কোনো প্রলেপ নেই মুখে।

তারার কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল সুধাময়, 'কি এমন করে বসেছিলে, অসুখ করেছে নাকি ?'

মৃদুভাবে মাথা দোলায় তারা। বলে, 'সামান্য একটু মাথা ধরেছিল। ভাবনার কিছু নেই।'

তারাব উত্তরে থমকে দাঁড়াল সুধাময়। কেমন এক সঙ্কোচ তার সমস্ত শরীরের রেখায়। আলতো, নরম হাতে তারার চিবুক ধরে বলল, 'আমায় যে আবার এখুনি পোষাক বদলে বেরুতে হবে। হেড অফিস থেকে জেনারেল ম্যানেজার ভিজিটে এসেছেন। ডিনারে আমাদের সকলকে মিট করবেন। ভেবেছিলাম তুমিও যাবে।'

'আমি ?' কেমন নিষ্প্রভ প্রশ্ন তারার। আর এই প্রশ্নের অন্তরালেই সে ভাবল, সে যাবে। সুধাময়কে সব সময় আড়াল করে রাখবে। যাতে সে প্রিয়তোষের কাছে যেতে না পারে। গল্প করতে কথা বলতে না পারে। একটু থেমে আবার অন্য কথার বাঁক নেয় তার মন। সে যাবে না, কিছুতেই যাবে না। সুধাময়ের অনুপস্থিতিতে সে যাবে প্রিয়তোষের কাছে। গিয়ে বলবে, যা তুমি চেয়েছিলে জানি, বেশ তাই নাও। আর আমাকে রেহাই দাও। এখান থেকে এই কলকাতা থেকে পারলে তুমি আজকেই চলে যাও।

তারা মনে মনে তাই ঠিক করল। সে গেল না। কিন্তু সুধাময়কে যেতেই হল। ঘর থেকে বারান্দায় এসে হঠাৎ যেন তার কি মনে হয়। তারার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছ, প্রিয়তোষের কাছে যাওয়াই হয়নি একবার। আর নিশ্চয়ই তুমিও যাওনি। এখনও তুমি যা লাজুক !'

আর কোনো কথা না বলে, সুধাময় তারার হাত ধরে প্রিয়তোষের সামনে গিয়ে হাজির। 'আমি একটু বেরুচ্ছি রে। তুই তারার সঙ্গে গল্প কর।'

ক্ষীণ এক জলের রেখা যেন নদী হল। হঠাৎ সোজা হয়ে

বসল প্রিয়তোষ। 'তারা, কে তারা? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত যেন উঠল তার মুখে।'

'কেন তাবা, নয়নতারা। আমার বৌ।'

এতক্ষণ আলতোভাবে প্রিয়তোষের হাত দুটো কাঁধ থেকে পাশে ঝুলে ছিল। এবার তা দ্রুত উঠে এল। বাঁ হাতে চশমাটা খুলে, ডান হাত দিয়ে চোখের ওপরকার নীল পর্দাটা একটানে সরিয়ে ফেলল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে তারার মনে হয়, চোখের লাল টিস্যুগুলি বুঝি রক্তে ফুলে উঠেছে। এখুনি, এখুনি এই চোখটাও তার যাবে।

তারা হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'কি করছেন আপনি, চোখটা ঢাকুন। এ চোখটাও যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

তারপর আব কথা বলতে পারল না। থরো-থরো বার কয় কাঁপল তার ঠোঁট।

একহাতে তারাকে জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে সুধাময় প্রিয়তোষকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিল। প্রিয়তোষ তখন অনেক শান্ত। পুরনো হাসিটা আবার ফিরে এসেছে মুখে।

তারার গায়ে মৃদু হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল সুধাময়, 'হঠাৎ এমন চিৎকার করলে, ভয় পেয়েছিলে?'

প্রিয়তোষের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, 'তোরও কি বুদ্ধি হবে না কোনোকালে? এমন করে চোখকে স্ট্রেন করলি?'

হাসিটা, তারার সেই পরিচিত হাসিটা তখনও প্রিয়তোষের মুখে লেগে। বলল, 'তোর বউ, তার মুখ দেখব না আমি?'

সুধাময় আর কোন কথা না বলে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারাও।

অন্ধকার ঘরে গিয়ে একটু বসল তারা। তারপর কলঘরে গেল। তখনও সে শাওয়ারটা খুলে দেয়নি। এক এক করে তার সমস্ত জামা [illegible] ফেলল। বেসিন থেকে জল নিয়ে একবার

চোখে, একবার মুখে ঝাপ্টা দিল। তারপর সে তাকাল নিজের দিকে যে-দেহের দিকেই তার সকলে তাকায়। কেমন ঘৃণা হল তারার সে ভাবে, এ দেহের ভার নিয়ে সে যেতে পারবে না প্রিয়তোষে কাছে।

তারপর হঠাৎ কি মনে হয় তারার। দ্রুত সে মুখে সাবান ঘষে। ভাবে, সে যাবে প্রিয়তোষের কাছে। হ্যাঁ যাবে ঠিকই গিয়ে আস্তে আস্তে সে হাত ধরে শুইয়ে দেবে তাকে খাটের ওপর বলবে, দেখ সেই তারা আব আমি 'নেই। তোমাব নয়ন হয়ে এসেছি। আমি স্নান করে এসেছি। প্রিয়তোষের মুখের ওপর, বুকের উপব ঝুঁকে পড়ে বলবে সে, আমার চোখ দিয়েই তুমি দেখ।

তারা শুনতে পায়। ও-ঘর জুড়ে প্রিয়তোষের পায়চারি. চটির গোড়ালির শব্দ, খুট খুট, খুট খুট।

এবার, এতক্ষণে শাওয়ার খুলে দিল তাবা। সমস্ত শরীরে জলের ঝরনা নেমে এল। জলের বিন্দুগুলো মোমের মত দানা বেঁধে মুখ থেকে বুকে, তারপব যেন কোন অরণ্য অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। জিভ দিয়ে চেটে চেটে তারা অনুভব করে ঠাণ্ডা জলের স্বাদ। অন্য ঘরের শব্দ আব তার কানে এসে পৌঁছুচ্ছে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে, কাপড় বদলে তারা বসল আয়নার সামনে। অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধন করল। মৃদুহাতে পাউডারের প্রলেপ দিল মুখে। একটু একটু অগুরুব ছিটে, সমস্ত কাপড়ে। তারপর রবারেব স্লিপার পায়ে গলিয়ে সে এগিয়ে এল, প্রিয়তোষের ঘরের দিকে। চটির হিস্ হিস্ শব্দে তাবার নিজেরই মনে হল, বুঝি এক সাপ, বিষের যন্ত্রণায় অস্থির, কাকে ছোবলাতে এগিয়ে চলেছে।

আর, আরো একটু এগিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিরাট শূন্য, নির্জন মনে হল তারার। সদরের দরজা খোলা। প্রিয়তোষের ঘরও খালি। নিঝুম। অন্ধকার।